প্রথম সংস্করণ

১৯৪৫

দাম ৩ টাকা

প্রকাশক : অমল বসু, ঈগল পাবলিসার্স

৩০৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকর : কিশোরীমোহন নন্দী, গুপ্তপ্রেস

৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

তেরটি গল্প

কীট

"দস্যু…দস্যু—তুমি আমার সর্বস্ব লুণ্ঠন ক'রেছ, কীটের মতো সংগোপনে এসে তুমি আমার বিশাল সাম্রাজ্য গ্রাস ক'রেছ—আমায় পথের ভিখারী ক'রেছ! দস্যু…"

আর্ত কণ্ঠের এবম্বিধ একটা চিৎকারে বিরাজবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। রাত তখন একটার কম নয়। এ হেন সময়ে এই রকম একটা চিৎকার শুনে তাঁর মত শান্তিপ্রিয় লোকের যে কতখানি আতঙ্ক মনের ভেতরে হ'তে পারে তা কল্পনা করা যায় না। বয়সে তিনি প্রাচীন এবং অবসর-প্রাপ্ত সাব-জজ্। সম্প্রতি তিনি এই পাড়ায় নতুন এসেছেন। তাঁর মত ভীরু প্রকৃতির লোক প্রথম রাত্রির এই ব্যাপারে ভয়ংকর বিচলিত হ'য়ে পড়লো।

ভয়ে ভয়ে তিনি রাস্তার দিকের জানালাটা খুলে ব্যাপারটা একটু বোঝবার চেষ্টা ক'রলেন। কিন্তু আর কোনো রকম সাড়া-শব্দ তিনি শুনতে পেলেন না—ঘুমন্ত নগরী গহন রাত্রির কোলে শুধু ঝিম্ ঝিম্ ক'রছে। এক ফালি চাঁদ ঝলমল ক'রছে আকাশের শুভ্র মেঘ-পাহাড়ের ওপরে আর অদূরে গোপনন্দিনীর বনাকীর্ণ তরঙ্গায়িত পাহাড়ের শ্রেণী কালো কালো দৈত্যের মতো যেন তাঁর কটাই ভ্রূকুটি ক'রে তাকিয়ে আছে।

আবার সেই দিকে চিৎকার ঃ '

"হাঃ হাঃ হাঃ···ক্ষমা···ক্ষমা ! ক্ষমা নেই"···

বিরাজবাবু আর শোনবার চেষ্টা ক'রলেন না—তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে সেখান থেকে সরে এলেন। কিছুক্ষণ তিনি বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। কি যে করা উচিত এ অবস্থায়—তিনি ভেবে উঠতে পারলেন না। মনে মনে শুধু ভাবলেন, কি সাংঘাতিক পাড়ায় তিনি এসে পড়েছেন আগে জানলে কখখনো তিনি এ পাড়ায় বাড়ী কিনতেন না।

বিহ্বল ভাবটা যখন তাঁর কেটে গেল তখন তিনি ঘরের দরজা খুলে পাশের ঘরের রুদ্ধ দরজায় টোকা দিয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন, মনো···মনো···

ঘরের ভেতর থেকে নারী কণ্ঠের উত্তর এল, যাই গো যাই। তারপর দরজা খুলে জনৈক স্থূলোদরা প্রৌঢ়া বেরিয়ে এলেন। নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে ব'ললেন, কী হ'লো—অতো চেঁচাচ্ছ কেন !

বড় খারাপ পাড়া এটা, বিরাজবাবু ব'ললেন, কী সব ভয়ংকর কথা ! শোন নি, না কি !

কই না তো !

তা শুনবে কেন। মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটা খুন হ'লো। খোকাকে ডাকি থামো। বিরাজবাবু দ্রুতপদে ছেলেকে ডাকতে এগিয়ে গেলেন। একটা কোণের ঘরের রুদ্ধ দরজায় টোকা দিয়ে ডাকলেন, তমাল···তমাল—ওঠ না একবার। ঘুমুলে কিছুই খেয়াল থাকে না দেখছি তোদের।···

তমাল বি-এ পড়ে, নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়—বয়েস হ'য়েছে। প্রাচীন পিতার একমাত্র পুত্র হ'য়ে সব সুখ-দুঃখের তার ভাগ নেওয়া প্রয়োজন। বিরাজবাবু এটা বারে বারে প্রতি কাজে ছেলেকে বোঝাতে চান। তমালও বুঝতে পারে এটুকু। তাই এতো রাত্রে পিতার কম্পিত কণ্ঠের আহ্বানে সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে চোখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস ক'রলো, ডাকছিলেন আমাকে ?

বিরাজবাবু বিরক্ত হয়ে ব'ললেন, হ্যাঁ! কি বিশ্রী পাড়াতেই বাড়ী পছন্দ করলি বল তো! কালই বাড়ী বদলাও।

কেন, হ'লো কী?

কেন, তুইও শুনিস্‌নি নাকি! যে চেঁচামেচি, মনে হ'চ্ছে—কোথাও কাছা-কাছি একটা খুন হ'লো। দরকার নেই অতো সবে—কালই বাড়ী বদলাও।

কিন্তু বাড়ী বদলাতে আর হ'লো না। অনুসন্ধানে জানা গেল: পাশাপাশি কেন—সারা শহরের মধ্যেই সাতদিনের ভেতরে কোনোরকম খুন-জখম হয় নি। সম্প্রতি এই পাড়াতে থিয়েটার হবে—তারই আয়োজন চলছে এবং যিনি নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন তিনি আজ পনেরো দিন যাবৎ গভীর রাত্রে স্টেজ্-ফ্রীর জন্য এবম্বিধ চিৎকার ক'রে থাকেন।

বিরাজবাবু সাময়িক ভাবে আশ্বস্ত হ'লেন বটে, তাহ'লেও তিনি নতুন জায়গায় বসবাসের জন্য শঙ্কিত সতর্ক দৃষ্টি চারিদিকে মেলে রাখলেন।

তাঁর মতো প্রকৃতির লোকের যথেষ্ট শঙ্কিত হবার কারণও আছে। সম্প্রতি মাস কয়েক মাত্র হ'লো, শহর থেকে সামরিক সান্ধ্য আইনটা উঠে গিয়েছে—কারণ সন্ত্রাসবাদীদের কোনো শাড়া-শব্দ আজ-কাল আর পাওয়া যাচ্ছে না। তা হ'লেও কিন্তু সরকারের মতো তিনি নিঃশঙ্কচিত্ত হ'তে পারেন নি। আজ অবসরপ্রাপ্ত হ'লেও একদা তিনি সরকারের লোক ছিলেন—এবং এই জন্যে লুক্কায়িত দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদীরা তাঁর ওপরেই যে জুলুম অথবা ভয়ংকর একটা কিছু ক'রে ফেলবে না—তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই জন্য সব সময়েই চলা ফেরা করেন তিনি ভয়ে ভয়ে।

কিন্তু মরণাপন্ন শহরটা যেন আবার বেঁচে উঠছে। একটা ক্ষুধার্ত কীট যেন এতোদিন তার বুকের ওপর বসে সমস্ত জীবনীশক্তিটা বুকের সঙ্গে চুষে খাচ্ছিল—এতোদিন পরে যেন শহরটা মুক্তি পেয়েছে তার কাছ থেকে—নিষ্কৃতি পেয়েছে। কটার পর পথে লোক চলাচল ছিল না, চল্লিশ বছরের প্রৌঢ়দেরও আতঙ্কের সীমা

ছিল না এতোদিন। সব যুবকের নামেই কার্ড ছিল—তাদের রং লাল, নীল অথবা সাদা যাই হোক না কেন—আতঙ্ক ছিল সব সমান। ধূসর গোধূলির মলিন ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরটা ঝিমিয়ে পড়তো। নিস্তব্ধ নিবিড় অন্ধকারের বুক চিরে সোজা বুকে এসে ঘা দিত অশ্বারোহী দু-একটা সার্জেন্টের ঘোড়ার খুরের শব্দ। শিশুর কান্না মাত্র দু-এক মুহূর্তের জন্যে শোনা যেত—ভোর সাতটা পর্যন্ত একাধিপত্য ক'রতো এই মৃত্যুর মতো ভয়ংকর স্তব্ধতা। রাত্রে প্রহরীদের একটু হুইসিলের শব্দ অথবা হাঁক-ডাক শুনলেই সকলে ভাবতো—সন্ত্রাসবাদীদের একটা দল বুঝি ধরা পড়লো—অথবা হয়তো লড়াই হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সকলে তৈরী হ'তো ঘর খানা-তল্লাসীর অজুহাতে সেপাইদের আগমন আর অত্যাচারের জন্য।

এখন যেন শহরটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। গোপনন্দিনীর পার্বত্য প্রদেশের দিকে যে রাঙামাটির পথটা এঁকে বেঁকে উঠে গিয়েছে, সেই পথের ওপরে ছোট ছোট সচঞ্চল তরুণ-তরুণীর দল—মুক্তির সহজ আনন্দে ঝলোমল ক'রছে তাদের কথা, তাদের হাসি, তাদের মুখ। বুকভরা চর কংসাবতী···দু-কূল ভরা এতোদিনের অখণ্ড নীরবতা ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে যাচ্ছে হালকা হাসিতে···ওপাশের ভাঙা বাঁশের সাঁকোটা আবার তৈরী হ'য়েছে নতুন ক'রে।

বিরাজবাবু বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে এই নাগরিক চঞ্চলতা দেখছিলেন এবং মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে উঠছিলেন ভয়ংকর। এমন সময়ে স্ত্রী পাশে এসে দাঁড়াতেই তিনি ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, দেখছো মনো—এদের ব্যাপার!

কেন, কি হ'লো?

মুক্তির ব্যবহার এরা জানে না। বিরাজবাবু খেঁকিয়ে উঠে ব'ললেন, এই সব ছেলে-ছোকরাদের দল বেপরোয়া ভাবে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে—গভর্ণমেণ্টের চোখে এসব তো সন্দেহজনক হ'তে পারে! এই দেখ না—ওই দলটা।—ফিস্ ফিস্ করে কী তোদের অতো কথা বাপু—কেন, জোরে কথা কইতে পারে না! শহরের সব···সব ছেলেমেয়েগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে, সবগুলো সন্ত্রাসবাদী। হাত-পা বাঁধা হয়ে ঘরের মধ্যে চুপ-চাপ বসে থাকতে এদের ভালো লাগে।···

স্ত্রী হেসে ব'ললেন, অদ্ভুত লোক তুমি—কি যে বলো !

বিরাজবাবু মাথা নেড়ে নেড়ে ব'ললেন, ঠিক ব'লছি আমি মনো—ঠিক ব'লছি। তমালকে বলে দিও—এদের কারুর সঙ্গে যেন মেশা-মেশি না করে, ভয়ংকর লোক এরা বাপু। সে কোথায়—তাকে দেখছিনে কেন ?

কলেজ থেকে এসেই তো সে কোথায় বেরিয়ে গেলো।

সর্বনাশ ! বিরাজবাবু ধপ্ করে পাশের আরাম কেদারায় বসে পড়লেন। নিতান্ত হতাশ কণ্ঠে ব'ললেন, কোথায় গেল সে ! নিশ্চয় সে এদের কারুর সঙ্গে মেশা-মিশি শুরু করেছে। না না মনো, এসব ভালো কথা নয়—বারণ ক'রে দিও তাকে। নিতান্তই যদি বেড়াবার ইচ্ছে থাকে তো যেন একা একা যায়। কিন্তু না বেরোনোই আমার মতে সব দিক দিয়ে ভালো।

স্ত্রী রেগে উঠলেন এবার—ব'ললেন, কী লোক তুমি ! জগৎশুদ্ধ সবাইকে তোমার অবিশ্বাস ! বিকেলের দিকে বাইরে বাইরে একটু না বেড়ালে ভালো লাগে—না, স্বাস্থ্য থাকে ! আমি কাল থেকে বেরোব—দেখি…

হতাশ হ'য়ে বিরাজবাবু ব'ললেন, বুড়ো বয়সে কেন আর আমার দুশ্চিন্তা বাড়াও তোমরা মনো ! তোমাদের ভালোর জন্যেই আমি বলছি। বেশ তো, স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য করছো,—বাড়ীতে ব্যায়াম ক'রো না কেন ! সমস্ত ব্যবস্থা আমি ক'রে দেবো।

স্ত্রী বিরক্ত হয়ে ব'ললেন, হঁ্যা—একে গতর নিয়ে নড়তে পারি নে, বাতের ব্যামো—বুড় বয়সে ব্যায়াম ক'রবো বৈকী।

বিরাজবাবু কলহের সূত্রপাতে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে ব'ললেন, আচ্ছা বেশ বেশ—ব্যায়াম তোমাদের করতে হবে না। একটা মোটর না হয় কিনবো—সন্ধ্যে নাগাদ্ যতো খুশি ঘুরে বেড়িয়ো। কিন্তু আমাকে কথা দিতে হবে মনো, বাড়ী থেকে বেরিয়ে তোমরা কোথাও থাম্বে না বা কারুর সঙ্গে আলাপ ক'রতে পাবে না। যতো তেল খরচা হয় আমার হবে।

তমালকে ঘরে আটকাবার জন্যে বিরাট লাইব্রেরী ছিল ঘরে, ব্যায়ামের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল—শেষ পর্যন্ত মোটর এলো কিন্তু তমাল এসব চায় না—খোঁজে সে জীবনের মানে। এতো আয়োজনের মাঝখানে, এতো স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝখানে—জীবন যেন তার বিষাক্ত হয়ে ওঠে—দুর্বিসহ হয়ে ওঠে দিন দিনে। কী যে সে চায়—এর হদিস্ আজও যেন সে পেলো না।

এ পাড়ায় এসে সে লক্ষ্য করেছে, রাত প্রায় আট-টা ন-টার সময় একটা অন্ধ গান ক'রতে ক'রতে ঠিক তার পড়বার ঘরের পাশ দিয়ে ভিক্ষে চেয়ে যায়। তার দুরবস্থা, তার ব্যাকুল মিনতি অসংখ্য ঢেউয়ের মতো বার বার গিয়ে আঘাত করে তমালকে।

···সে অন্ধ। তার দুঃখ সে বোঝাতে পারবে না ভাষায়—কেউ বুঝবেও না হয়তো। তাকে সকলে দয়া করো—এই অন্ধকার বীভৎস রাত্রে তার নিপীড়িত ভবঘুরে জীবন নিয়ে সে একা।···

কোন অজ্ঞাত কবির রচিত এই গানখানি—তমাল জানে না। শুধু তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। ভাবে—এইটাই কী জীবন! তমাল তার চার পাশের অপর্যাপ্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে চায় না। কি যে চায়—তাও সে ঠিক জানে না।

তমালের দর্শনবিলাস মা এসে ভেঙে দিলেন। ব'ললেন, খোকা—খাবি আয়। আজ বিকেলে তো খেয়ে বেরোস নি, আয় উঠে···

মা চলে যাচ্ছিলেন—তমাল পেছনে ব'লে উঠলো, জীবনটাকে আমার মাটি ক'রে দিচ্ছ তোমরা।

মা ফিরে দাঁড়িয়ে ব'ললেন, আচ্ছা পাগলা ছেলে তো! যখন তখন তুই ওই কথা বলিস—কেন বলতো? কি ক'রলুম আমরা তোর?

উত্তরে কি ব'লবে তমাল ভেবে পায় না।

মা ব'ললেন, যা তোর খুশি হচ্ছে, তাই তুই ক'রছিস। তবু···

তমাল নিশ্চুপ নিরুত্তর। তারপর হঠাৎ সে মন্থর কণ্ঠে ব'ললো, একটা অন্ধ স্ত্রী বিশ্রী গান গেয়ে যায়—শুনেছো মা! ও আমাকে পাগল ক'রে ছাড়বে। দুঃখ দুঃখ! আমরাই কি সুখে আছি?…

মা ব'লতে যাচ্ছিলেন, তোর ওসব পাগলামি বুঝি নে আমি—কিন্তু এই সময়ে বিরাজবাবু সেই ঘরে এসে ঢোকায় তিনি চুপ ক'রে গেলেন। বিরাজবাবু তমালের দিকে তাকিয়ে ব'ললেন, তুই কি যেন বলছিলি না তমাল! ওসব সাংঘাতিক কথা! বার বার তোকে ব'লেছি—এই বিশ্রী শহরের কারুর সঙ্গে মিশবিনে, কোনো সভা-সমিতিতে না। কমিউনিস্টদের মতবাদ বড় সাংঘাতিক জিনিস—সরকারের চোখে পড়লে…বিরাজবাবু চোখ উলটে আঁতকে উঠলেন—ব'ললেন, বুড়ো বয়সের পেন্‌সনটা কেন তোরা মারতে চাস্ বাপু।…

তমাল নিঃশব্দে চেয়ে থাকে বিরাজবাবুর দিকে ঃ

…সেই অন্ধ ভিখিরীটা তমালের জীবনকে উত্যক্ত করে তুলেছে। তার চিন্তাধারার সঙ্গে সাম্যবাদের কোনো সম্বন্ধ আছে কি না সে কোনোদিন ভেবে দেখে নি,—তবে সে ভেবে দেখেছে, জীবন তার দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায়।…

তারপর হঠাৎ তমাল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

একজন দীর্ঘদেহী সুদর্শন যুবক ফটক খুলে ঢুকলো। তমাল তাকে সংবর্ধনা করে সোজা ওপরের বসবার ঘরে নিয়ে গেল।

নবাগত ব'ললো, দু-দিন আজ দেখা নেই যে তোমার!…

তমাল উত্তর দিল, মনটা ভালো ছিল না। তা'ছাড়া শরীরটাও সুবিধে যাচ্ছে না।

মন তো তোমার কোনদিনই ভাল থাকে না, তবে শরীর সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। শহরে যে রকম বসন্ত হচ্ছে…একটু সাবধানে থেকো।

তারপর দু-বন্ধু বেরিয়ে গেল।

একটি অপরিচিত মুখ। বিরাজবাবু আঁতকে উঠলেন। স্ত্রীকে এসে জিজ্ঞেস ক'রলেন, ও কে মনো? তমালের সঙ্গে গেল!…

স্ত্রী ব'ললেন, তমালের বন্ধু। কেন, খ্যাখোনি ওকে আগে?

আমি যা পছন্দ করি নে তাই তোমরা ক'রবে। তমাল গেল কোথায় ওর সঙ্গে?

কোথায় আর—বেড়াতে গেল বোধ হয় অনিরুদ্ধর সঙ্গে—রোজ যেমন যায়।

রোজ যায়! বলো কী! এই সন্ধ্যের সময়—বিরাজবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে ব'ললেন, তবে মোটর কিনলেম কি জন্যে? দেখতে হবে না আর—নিশ্চয়ই কোনো সঙ্ঘ-সমিতিতে নাম লিখিয়েছে। যতো করে বলি…তাছাড়া অনিরুদ্ধ না কি নাম বল্লে, ওর চেহারা দেখলেই যে ভয় লাগে গো!…

স্ত্রী রাগ ক'রে ব'ললেন, তোমার তো সবটাতেই ভয়। কারুর ভালো সহ্য ক'রতে পারো না।

যা খুশি করো তোমরা—ব'লে বিরাজবাবু রাগে মুখভার ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

স্ত্রী মৃদু হেসে ব'ললেন, সবটাতেই তোমার অবিশ্বাস। ওদের দু-জনের কত বন্ধুত্ব। অনিরুদ্ধ এলে তমাল দেখি ভারী খুশি হয়, ওর আদর যত্নে সে বেচারী অস্থির হ'য়ে ওঠে।

বিরাজবাবু শঙ্কা-ভরা কণ্ঠে ব'ললেন, হবে না! একই সমিতির সভ্য হয়তো। ডোবালে তোমরা আমাকে—ডোবালে।

তমাল বই থেকে মুখ তুলে শুনলো, সেই অন্ধটা তার সেই চিরপরিচিত গানটা গেয়ে গেয়ে যাচ্ছে: অন্তহীন চলার পথে সে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই কি জীবন!

হঠাৎ তার চিন্তার সূতো গেল ছিঁড়ে। ও-পাশের বসবার ঘর থেকে বিরাজ-বাবুর সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল এবং আরো একটা কণ্ঠস্বর—অনিরুদ্ধর।

বিরাজবাবু জিজ্ঞেস ক'রছেন, সন্ত্রাসবাদীদের তুমি সমর্থন করো? তাদের কোনো সমিতিতে তুমি যোগ দিয়েছ? তমাল দিয়েছে?—ইত্যাকার অদ্ভুত প্রশ্ন সব। অনিরুদ্ধর কাছ থেকে সবগুলোর 'না' উত্তর পেয়ে বিরাজবাবু শেষ পর্যন্ত খেঁকিয়ে উঠলেন, আলবত তোমরা ওদের সমর্থন করো। পাছে বিরাজবাবু এমন কোনো অভদ্রোচিত কথা ব'লে ফেলেন যাতে অনিরুদ্ধ হয়তো অপমান বোধ ক'রতে পারে, এই জন্য তমাল তাড়াতাড়ি ওঘরের দিকে ছুটে গেল। তমালের বিরক্তি-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে বিরাজবাবু ধীরে ধীরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর তমালও বেরিয়ে গেল অনিরুদ্ধকে নিয়ে। রাত তখন প্রায় আটটা।

বিরাজবাবু এই অসময়ে তমালকে অনিরুদ্ধর সঙ্গে বেরিয়ে যেতে দেখে অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি শুনেছেন—অনিরুদ্ধ তমালকে ডেকে নিয়ে গেল। কিন্তু কোথায় নিয়ে গেল! কোথায় ওদের গুপ্তসভা আজ বসবে!

স্ত্রীর কাছে গিয়ে বিরাজবাবু অস্থিরভাবে ব'ললেন, দেখছ তো তমালের কাণ্ডটা! আমার বুড়োবয়সের পেন্‌সনটা এবার গেল—নিতান্তই গেল।

স্ত্রী বিরক্ত হ'য়ে উত্তর দিলেন, কেন, কি হলো আবার?

গেল ওই অনিরুদ্ধটার সঙ্গে বেরিয়ে। শেষকালে আমার ছেলে কি না ঢুকলো সন্ত্রাসবাদীদের দলে!

বিরাজবাবু বিপুল বিরক্তির ভাব নিয়ে সোজা ঢুকলেন লাইব্রেরী ঘরে। একটা আলমারী খুলে এ-বই সে-বই নাড়া-চাড়া ক'রতে ক'রতে একখানা সুন্দর খাতা টেনে আনলেন সকৌতূহলে। তমালের কবিতার খাতা। প্রথম পাতা উল্টোতেই প্রথম কবিতার প্রথম লাইনটা নেচে উঠলো বিরাজবাবুর চোখের সামনে—

দেহের চঞ্চল রক্তে এলো তব আদি আবাহন।

দ্বিতীয় কবিতার তৃতীয় লাইন—

অসহ্য সুন্দর তুমি রক্তের মতন।

তৃতীয় কবিতা—

রক্ত···

কেবল রক্ত···রক্ত···রক্ত। বিরাজবাবুর মাথা গরম হয়ে উঠলো। তিনি যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন—রক্তাক্ত দেহে মাটিতে কে একজন পড়ে আছে, সৈনিকের পোষাকে—পাশে ছোরা হাতে উত্তেজিত ভাবে তমাল দাঁড়িয়ে। বিরাজ-বাবু আত্মস্থ হয়ে কবিতার খাতাখানা নিয়ে দ্রুত পায়ে চললেন স্ত্রীর উদ্দেশ্যে।

স্ত্রীর সুমুখে কবিতার খাতাখানা মেলে ধরে ব'লে উঠলেন, গ্যাখো, গ্যাখো মনো—তমালের লেখা···মানে···কবিতা। ঠিক যা সন্দেহ ক'রেছিলাম তাই। কবে পুলিস ঘর খানাতল্লাসী ক'রবে, এই খাতাখানা হাতে পড়লে তাদের—আর কী উদ্ধার আছে ভেবেছ? বুড়ো বাপ, বুড়ো মা—তমালের সেদিকে কী খেয়াল আছে একটু! যতো সব খুনীর দলে গিয়ে মিশেছে। আবার রোজ যাওয়া চাই সেখানে, সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, রাত দুপুর নেই।···পুড়িয়ে ফ্যালা উচিত খাতাখানা।

তমাল এই সময়ে সেই ঘরে ঢুকলো।

হঠাৎ অপ্রতিভ বিরাজবাবু তাকে লক্ষ্য ক'রে ব'ললেন, এই যে তমাল। এ খাতাখানা অমন জায়গায় রাখে না কী! কী ভয়ংকর সব কথা!···যা খুশি করো তোমরা।

বিরাজবাবু দ্রুত সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তমাল মার কাছ থেকে আগা-গোড়া ব্যাপারটা শুনে বিরক্ত হ'য়ে ব'ললো, এ বাড়ীতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি আমি। বাড়ীতে কোনো ভদ্রলোক এলে, কোন বন্ধু-বান্ধব এলে তাকে পাঁচরকম জিজ্ঞাসাবাদ! ভালো লাগে না আমার। পালাবো যেদিকে খুশি।

পরদিন সকালের ব্যাপার।

তমাল নেই।

বেলা একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় বেড়ে আবার কমতে শুরু করেছে—তমাল তবু ফিরলো না। মা ভয়ানক উতলা, বিরাজবাবু দুঃখে ও ক্ষোভে ঘর-বার

ক'রছেন। তিনি মনে মনে বুঝতে পেরেছেন, তমাল সোজা সন্ত্রাসবাদীদের আড্ডাতেই গিয়ে উঠেছে, আর কোনো সন্দেহ নেই।

বিরাজবাবু ভারাক্রান্ত মনে বাইরের ঘরে বসেছিলেন। ঘরের কোণে কোণে ক্রমশ সন্ধ্যার অন্ধকার জমে আসছিল। এক সময়ে চাকর এসে টেবিলের আলোটা জ্বেলে দিয়ে গেল। বিরাজবাবুর নজর পড়লো টেবিলের ওপরে একখানা লাল কার্ডের ওপর। পাড়ায় থিয়েটার হবে, তারই নিমন্ত্রণ লিপি, মাস ছয়েক ধরে ওদের ভীতিপ্রদ রিহার্সাল চলছে। তমালের যাওয়ার কথা ছিল। বিরাজবাবুর স্নেহাতুর চোখ দুটো ছল ছল্ করে উঠলো। তমাল যেন ফিরে আসবে না আর কোনোদিন।

কিছুক্ষণ পরে তাঁরই মতো এক প্রাচীন ভদ্রলোক ঘরের ভেতরে ঢুকলেন। বিরাজবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, এইটা কী বিরাজবাবুর বাড়ী ?

হ্যাঁ, কাকে চাই আপনার ?

বিরাজবাবুকে। তাঁর সঙ্গে কী এখন দেখা হবে ?

আমিই বিরাজ। কেন বলুন তো ?

বিরাজবাবু উঠে দাঁড়ালেন, কণ্ঠে প্রবল ঔৎসুক্য—জিজ্ঞেস ক'রলেন, জানেন তার খবর আপনি ? সকাল থেকে সে বেরিয়েছে কোথায়, এখনো ফেরে নি।

হুঁ। থাকবার কথাও নয়। ভদ্রলোক চেয়ার টেনে বসলেন মুখ নিচু ক'রে।

বিরাজবাবু জিজ্ঞেস ক'রলেন, তার কোনো খবর জানেন আপনি ?

আগন্তুক মন্থর কণ্ঠে ব'ললেন, সে এখন কোথায় তা জানিনে, বোধ করি এ শহরের মধ্যেই নেই—দূরে কোথাও চলে গিয়েছে। আমার মেয়ে তমসাও তার সঙ্গে গিয়েছে।

আগন্তুক পদস্থ এক রাজকর্মচারী। নিজের পরিচয় দিয়ে ধীরে ধীরে যা বর্ণনা করে গেলেন তার সারাংশটা প্রেম-সম্পর্কিত একটা ঘটনা। তমাল আগন্তুকের মেয়ে তমসাকে ভালোবাসতো এবং একদিন বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাবও করে। কিন্তু বৃদ্ধ রাজী হতে পারেন নি—কারণ বারীদ্ রায়

—আই, সি, এস-এর সঙ্গে তিনি তমসার সম্বন্ধ একরকম পাকা ক'রে ফেলেছিলেন। সেই মতো বারীদ কাল সন্ধ্যায় একেবারে এনগেজমেণ্ট রিং নিয়ে এসে হাজির। কিন্তু এদিকে তমসা তমালের সঙ্গে চলে গিয়েছে কোথায়—সকাল থেকে দেখা নেই।

আগন্তুক শেষ কালে ব'ললেন, আমি এতটা জানতুম না। আমার ছেলে অনিরুদ্ধ অবিশ্যি আগা-গোড়া সবটাই জানতো কিন্তু এতদিন আমাকে কিছুই জানায় নি।

বিরাজবাবু কোনো রকমে তমালের এই ব্যাপার যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। মনে মনে তিনি ভাবছিলেন, তমাল রোজ কী এই ভদ্রলোকের বাড়ীতেই যেতো তবে! অথচ তিনি ভাবতেন···অসম্ভব, সে সন্ত্রাসবাদীদের দলেই গিয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধ নামটা সব গোলমাল ক'রে দিল। তার অনেক দিনের অনেক যাওয়া-আসা আজ নতুনতর অর্থের সৃষ্টি ক'রলো।

আগন্তুক বৃদ্ধ ভদ্রলোক পকেট থেকে একখানা চিঠি বের ক'রে টেবিলের ওপরে রেখে ব'ললেন, এই তাদের দু-জনের চিঠি—আশীর্বাদ চেয়ে গিয়েছে।

বিরাজবাবু চিঠিটায় তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে গেলেন। তারপর তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠলো। অদ্ভুত একটা চাপা গলায় ব'ললেন, এর আগে তার মরণ হ'লো না কেন!

তারপর নিঃশব্দে দুটি প্রাচীন মূর্তি বসে রইলো মুখোমুখি। অদূরে গোপনন্দিনীর পাহাড় ভেঙে অন্ধকার ঘন হয়ে এল ঘরে।

১৩৪৪

ফসল

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল লক্ষ্মণের—মনে পড়ে গেল, কামার-বাড়ী যেতে হবে ভোর ভোর। চোখ ঘষতে ঘষতে বাইরে বেরিয়ে এল সে, দেখলো—রাত তখনো ভোর হয় নি।

শীতের শেষরাত্রি। কুয়াশায় রাত্রির ঠাণ্ডা অন্ধকার আদিগন্ত শাদা ধোঁয়ার মতো ধব্ ধব্ ক'রছে। সবুজ ঘাসের ওপরে শিশিরবিন্দুগুলি ঝকমক্ ক'রছে অন্ধকারে, আর পোকামাকড়ের অবিশ্রাম ঝিকৃঝিক্ শব্দ। লক্ষ্মণ শিস্ দিতে দিতে বাঁধের ওপরে মাঠের ধারে এসে দাঁড়ালো।

দিগন্তের ঘন বনসীমার মাথার ওপরে শুকতারাটা তখনো জ্বল্‌জ্বল্ ক'রছে। মাঠের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল লক্ষ্মণ। ভালো লাগার একটি নিঃশব্দ আনন্দ তার সমস্ত মনে সঞ্চারিত হয়ে গেল। ধানগাছগুলি পাকা ফসলের ভারে নুয়ে পড়েছে মাটিতে। একটি ডাহুক এতক্ষণ নিঃশব্দে কোথায় ধানের শীষ টেনে টেনে খাচ্ছিলো—লক্ষ্মণের পায়ের শব্দে ডানার ঝাপ্‌টা মেরে মাঝ-মাঠের দিকে উড়ে গেল সেটা। সেই ঝাপটায় নিটোল ধানের পাকা শীষগুলি সর্ সর্ ক'রে উঠলো। পরের দিন রাত্রির মধ্যে ধান কেটে শেষ ক'রতেই হবে তাকে, হ্যাঁ—কালকেই। মনে মনে ঠিক ক'রে ফেললো সে—লঘু আনন্দে মন গেল ভরে : গেল বছরের চেয়ে ভালো ধান এবার পাবে সে। মাঠের ধান দেখা যায় না

কুয়াশায় আর রাত্রিতে—তবু নিটোল ধানের শীষগুলি সে যেন স্পষ্ট অনুভব করলো দু-চোখ দিয়ে, সমস্ত চেতনা দিয়ে। তার পর আবার শিস্ দিতে দিতে ঘরের দিকে ফিরলো সে। বেশ শীত পড়েছে।

বিছানায় এসে সে বসে রইলো ভোরের অপেক্ষায়। আগাগোড়া কাঁথা মুড় দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে হেমন্ত। তাকে ঠেলা দিয়ে ডাকলো—এই হিমি, এই—

হেমন্ত ঘুমের ঘোরে নিরুত্তরে পাশ ফিরে শুল তার দিকে মুখ ক'রে।

তার পর রইলো পড়ে হেমন্ত। কত ধান এবার পাবে সে—মনে মনে তারই একটা আন্দাজ ক'রবার চেষ্টা ক'রতে লাগলো। বছরের খরচ—এটা-ওটা-সেটা, খুঁটিনাটি অনেক খরচ। সংসারের বহু অভাব-অভিযোগের মাঝখানে হঠাৎ হেমন্ত সুন্দর আর স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তার জন্যে একটা গন্ধতেল কিনতেই হবে এবার। বেচারী সেই যে কবে ব'লেছিল ক-দিন—তার পর বোধ হয় ক্ষুণ্ণ মনের হতাশায় বলে নি কোনোদিন আর—হয়ত ব'লতে সাহস পায় নি। লক্ষ্মণকে যেন একটু ভয় করে। ভয়ানক শান্ত আর ভীতু হেমন্ত। তুল্‌তুলে ছোটো-খাটো মেয়েটি। লক্ষ্মণ আস্তে আস্তে হেমন্তের একরাশি এলো-মেলো চুলের ওপর আঙুল বুলোতে লাগলো। মনে ঘন-ঘোর স্বপ্ন তার—আসন্ন সুখের দিন। হেমন্তের চুল থেকে হঠাৎ একটা সুগন্ধি তেলের অপরিচিত মিঠে গন্ধ যেন নাকে এসে লাগে লক্ষ্মণের।

লক্ষ্মণ ডাকলো, এই ওঠ্ না—ভোর হ'ল।

হেমন্ত নিরুত্তর। রাত তখনো ভোর হয় নি। তবু শুয়ে পড়লে পাছে আবার ঘুম ধরে যায়—এই ভয়ে খাড়া বসে রইলো লক্ষ্মণ। ভোর ভোর কামার-বাড়ী যেতে হবে তাকে। আবার আস্তে আস্তে ভবিষ্যতের স্বপ্নে ভোর হয়ে যায় লক্ষ্মণ। নানান খরচ, নানান প্রয়োজন মাঠের পাকা ফসলের মুখ চেয়ে অপেক্ষা ক'রে আছে। নানান কথার মাঝখানে আবার মনে পড়ে গেল তার হেমন্তের গন্ধতেলের কথা। তার পর সেইটাই শুধু ঘোরাফেরা ক'রতে লাগলো তার মনের মধ্যে। একটা আবেগ যেন ঠেলে ওঠে বুকের ভেতরে।

সেটাকে আর চেপে রাখা যেন অসহ্য হয়ে ওঠে। ব'লে ফেললো, এবার তোর সেই গন্ধতেলটা এনে দেবো। মাঠের ধানটা উঠলেই—

লক্ষ্মণের কথার মাঝখানে হেমন্ত শুধু ব'ললো, হুঁ।

লক্ষ্মণের মনে হ'ল—তার কথা যেন বিশ্বাস ক'রছে না হেমন্ত। অভাবের সংসার তার—নিরূপায় সে। তবু মুহূর্তের উদ্দাম বিদ্রোহে সে শুধু ব'ললো, আচ্ছা দেখিস। পরিমিত জীবনযাপনের সুনির্দিষ্ট অনটন অত্যন্ত পরিচিত তার। আজ বাধাবন্ধনহীন আনন্দের সামান্য একটু দুরাশা তার নিজের বিরুদ্ধে, সমস্ত অবস্থার বিরুদ্ধে যেন বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে বসলো। ঝোঁকের মাথায় ব'লে ফেললো সে, আর সেইরকম নীল ডুরে শাড়ী। দেখিস্‌।

নীল ডুরে শাড়ীতে চমৎকার দেখায় হেমন্তকে—আর সে ভালও বাসে ওইরকম শাড়ী পরতে। বিয়ের সময়ের সেই নীল ডুরে শাড়ীখানি শতছিন্ন হয়ে গিয়েছে একেবারে। কিন্তু সেটা এখনো আছে পুঁটলিতে বাঁধা—মাঝে মাঝে খুলে দেখে সেটা হেমন্ত। কত দাম হ'তে পারে সেইরকম একখানা শাড়ীর! আন্দাজ করবার চেষ্টা ক'রলো লক্ষ্মণ—তার পর ঠিক ক'রলো: শাড়ীও একখানা কিনবে সে।

…উঠনে স্তূপীকৃত ধান—বাইরে নতুন খড়ের গাদা, সারস আর পায়রার ঝাঁক নেমেছে নতুন ধানের লোভে। হেমন্ত নবান্নের আয়োজনে ব্যস্ত—নীল ডুরে শাড়ী তার পরণে। হেমন্ত যেন চলে গেল তার সুমুখ দিয়ে—উঠনে স্তূপীকৃত নূতন ধানের পাশ দিয়ে—তার শাড়ীর নীল ডোরাগুলি স্পন্দমান চওড়া পাছার ওপরে কেঁপে কেঁপে নাচছে।…

ধানের গায়ে হলদে রং লেগেছে—অফুরন্ত স্বপ্ন লক্ষ্মণের।

হেমন্ত নীরব। লক্ষ্মণ যেন নিজেকেই শুনিয়ে ব'ললো, আচ্ছা—দেখতে পাবি এবার নবান্নের দিন।

এবার হেমন্তের দুটি হাত লক্ষ্মণের কোমর বেষ্টন ক'রে জড়িয়ে গেল। আড়মোড়া ভেঙে হেসে ব'ললো, আমি কি অবিশ্বাস ক'রছি! এখনও রাত আছে অনেক. শুয়ে পড়। শীত ক'রছে না তোমার?

···রাত আছে এখনও—খানিকক্ষণ শুলেও চলে।···

হেমন্তের দুটো হাতের মৃদু আকর্ষণে লক্ষণের সর্বাঙ্গে একটা দুরন্ত জীবন মাথা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। দুটো শিরাস্ফীত কর্কশ হাত সৃষ্টির নির্দিষ্ট একটা আবেগে কুমোরের মতো যেন দুই তাল মাটি থাবা মেরে ধরে।

হাসে হেমন্ত। হঠাৎ দমকা হাওয়া লাগা লক্ষ্মণের মর্মরিত ছোট ধানক্ষেত-টুকুর মত।

গিরিশ কামারের লোহা পেটার একটানা ঠং ঠং শব্দ শুনতে শুনতে পথ দিয়ে একমনে হাঁটছে লক্ষ্মণ। হঠাৎ সে থম্‌কে দাঁড়ালো ঃ কে যেন ডাকছে কোত্থেকে তাকে। লক্ষ্মণ ঘুরে তাকিয়ে দেখলো, মাঠের ধানবন ভেঙে পরেশ আসছে।

লক্ষ্মণ দাঁড়ালো। পরেশ কাছে এল ঃ কোথায় যাচ্ছিস ?

কামার বাড়ী।

চল্‌—আমিও যাব।

দু-জনে হাঁটতে লাগলো পাশাপাশি।

পরেশ হেসে ব'ললো, তোর ধান যে তোকে ডাকছে রে।

লক্ষ্মণ হেসে ব'ললো, তোর হাতে খবর দিল বুঝি ?

হ্যাঁ—ওই দেখ না।

দু-জনেই ঘুরে দাঁড়ালো মাঠের দিকে। মাঝখানের মাঠে খানিকটা জায়গা জুড়ে ধানগাছের গায়ে সবুজ রং লেগে রয়েছে তখনও। তারই মাঝখানে লক্ষ্মণের জমিটুকুতে ধানগাছের রং প্রায় মিশে গিয়েছে পাকা ধানের হল্‌দে রঙের সঙ্গে। উত্তুরে হাওয়ায় ধানগাছগুলি কাঁপছে।

পরেশ হেসে ব'ললো, ডাকছে কি-না দেখ।

দু-জনে মুখোমুখি চেয়ে নিঃশব্দে হেসে আবার চলতে লাগলো। তার পর ধীরে ধীরে সে মুখ হয়ে গেল কালো পাথর।

লক্ষ্মণ ব'ললো, আর দেরি নয়—আজ রাত্রেই কেটে সব শেষ ক'রব ভাবছি। দু-জন লোক ঠিক ক'রে রেখেছি। কেটে একেবারে শ্বশুরবাড়ী চালান দিয়ে দেবো রাতারাতি।

পরেশের চোখে হঠাৎ পুঞ্জীভূত ভয় একটা কালো হয়ে উঠলো। ব'ললো, খবরদার ও-কাজ করিস নি লক্ষ্মণ—তোর জন্যে তা হ'লে সব চাষী মারা পড়বে। আর দু-এক দিন সবুর কর—রাতারাতি সব একসঙ্গে কাটা শেষ হয়ে চালান হয়ে যাবে। কিচ্ছু ভাবতে হবে না তোকে।

লক্ষ্মণ অধৈর্য হয়ে ব'ললো, দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে—ধানগাছ আর দাঁড়াতে পারছে না। দেখ্ না—সব শুয়ে পড়েছে। দেরি করছে কেন রায়বাবুরা আর! একবার হুকুম দিলে তো হয়।

পরেশ চাপা গলায় ব'ললো, আর দু-এক দিন সবুর কর—হবে, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

আর এর মধ্যে চৌধুরীরা এসে যদি হাঙ্গাম বাধায়!

চৌধুরীরা ভিতরের খবর কিচ্ছু জানে না। ওদের সঙ্গে লাঠালাঠি ক'রে রায়বাবুরা তো আর পারবে না। তিন-শ' লোক্ লাগিয়ে একেবারে রাতারাতি মাঠের ধান সরিয়ে ফেলবে একদিন।

ও-সব বড়লোকের বিরোধ গোলমালের ব্যাপার জানতেও ইচ্ছে নেই লক্ষ্মণের—শুনতেও ভাল লাগে না তার। শুধু মাঠের ধানগুলি তার ঘরে উঠলে হ'ল। চৌধুরী এবং রায় মরুক মারামারি আর লাঠালাঠি ক'রে। সে তো বহু দিনের শত্রুতা—বহু দিন থেকেই চলে আসছে। তাদের বিরোধের মাঝখানে ওরা শুধু জৈষ্ঠের বিদীর্ণ মাঠের মত ধূ ধূ করে।

কামারশালের সুমুখে চাষীরা এসে ভীড় করছে অনেকে—রোদে পিঠ দিয়ে বসেছে সব। গিরিশ এক-মনে হাতুড়ি পিটছে।

লক্ষ্মণ চুপি চুপি ব'ললো, আমার কাস্তেগুলো কখন দেবে গিরিশ-দা?

কাজে ব্যস্ত গিরিশ। মুখ না তুলেই ব'ললো, হবে হবে ভাই, সব একসঙ্গে হবে। তুই যা দিকিন—ওই ওদের সঙ্গে বসে কাস্তের বাঁট তৈরি ক'রে ফেল্।

গিরিশ একমনে হাতুড়ি পিটতে লাগলো।

লক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার হাতুড়ি-পেটা দেখতে লাগলো। তার পর ব'ললো, কবে হবে ?

কাল ভোর ভোর এসে সব নিয়ে যাস্। অত তাড়াহুড়ো কিসের! সব একসঙ্গে হবে।

কামারশালে ব'সে ব'সে লোহা পিটছো তুমি—মাঠের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছ ? লক্ষ্মণ হেসে ব'ললো, ঘরে আসবার জন্যে লক্ষ্মীঠাকরুণ সেখানে হাঁ ক'রে ব'সে আছে জান ?

আর লক্ষ্মীঠাকরুণ বুঝি আমার ঘরে আসবে না ? গিরিশ মুখ তুলে একটু হাসলো। হাতুড়ি পিটতে পিটতে ব'ললো, অনেকগুলো খরচ আছে আমার রে—মাঠের ধানটা উঠলে হয়। এই শীতের মধ্যে ছেলের বিয়ে দিতেই হবে। কেশরগাঁয়ের মেয়েটিকে দেখে ছেলের আমার ভয়ানক মনে ধরে গিয়েছে —কদিন খুব ঘোরাঘুরি করছে ওদিকে। সে তো মাঠের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে আছে—কবে ধান উঠবে ঘরে। ব'লে গিরিশ হাসতে লাগলো।

গিরিশ আবার ব'ললো, এই দেখ না—কদিন কাজের চাপে যেতে পারে নি ওদিকে। আজ ভোর থেকেই সরে পড়েছে—পাছে আটকা পড়ে যায়।

লক্ষ্মণ হেসে ব'ললো, দাও না ওর বিয়ে এবার।

দেবো ভাই, ধান কাটা শেষ হ'লেই দেবো। আত্মগত ভাবে তার পর গিরিশ বলে, বুড়ো হয়ে পড়লুম—আর কত দিন হাতুড়ি পিটবো!

…ডুরে নীল শাড়ী আর গন্ধ তেল…

লক্ষ্মণ অন্যমনস্ক হয়ে বলে, ধানটা ঘরে উঠলে হয়—নবান্নের আগে আমারও কিছু খরচ আছে গিরিশ-দা।

গিরিশ হাতুড়ি পিটতে পিটতে বলে, খরচ কি শুধু তোর একার ভাই—সকলেরই খরচ আছে। জামা-কাপড়, ঘর-দোর—

আগামী স্বল্প সংকীর্ণ আনন্দের দিন কটি—ভবিষ্যতের সমস্ত হাসিমুখগুলি ঘোরাফেরা করছে সকলের মনে মনে, আর মাঠের ধানবনে।

ক্ষুন্ন লক্ষ্মণ কামারশাল ছেড়ে ঘরের দিকে ফিরলো। চারিদিকের একটা শক্ত বাঁধনের মাঝখানে যেন বাঁধা পড়ে গিয়েছে সে। একা তার বেরিয়ে আসার কোনো উপায় নেই। সারা গাঁয়ের সঙ্গে তাকেও মুখ চেয়ে ব'সে থাকতে হবে আর একজনের।

ছায়াচ্ছন্ন ঘন বসতি ছেড়ে মাঠের পাশের পথটিতে এসে পড়লো সে। কামারশালের লোহা পেটার শব্দ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল। লক্ষ্মণ এগিয়ে চলেছে অন্যমনে। পথের একটা বাঁক ঘুরতেই সে দেখতে পেল, দূরে—মাঠের দিকে ঝুঁকে-পড়া একটা খেজুর গাছের তলে একটি ছোট্ট ছেলের সঙ্গে হেমন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কইছে—কাঁখে তার জলের কলসী। লক্ষ্মণ নিঃশব্দে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো।

হেমন্ত তখন বোঝাচ্ছে ছেলেটিকে, আর কবে তোর বাপ জামা এনে দেবে? এক কাজ কর—খুব ক'রে কান্নাকাটি ক'রবি। শীত শেষ হয়ে গেলে জামা নিয়ে আর কি হবে!

কচি ছেলেটি মুখ ভার ক'রে ব'ললো, কাঁদলে মারে যে। ব'লেছে, ধানকাটা শেষ হয়ে গেলে দেবে।

হেমন্ত ভেংচি কেটে ব'ললো, দে-বে।—খুব ক'রে কাঁদবি।…

পেছন থেকে লক্ষ্মণ হেসে উঠলো—ব'ললো, কেন ওকে আবার ক্ষেপিয়ে দিচ্ছিস? জ্বালাতন হয়ে মরবে বেচারী নিতাই—ও বেচারীও মার খাবে। তুই ভারি ইয়ে—

হেমন্ত লক্ষ্মণের দিকে ঘুরে হেসে ব'ললো, দেখো না—ওই অতটুকু কচি ছেলে, তাকে জামার লোভ দেখিয়ে বসিয়ে রেখেছে এইখানে—ধানে গরু

পড়লে তাড়াবে। ও তাই পারে নাকি! এক্ষুনি পড়েছিল বলদের শিঙের মুখে।

তাতে তোর কি ?

হেমন্ত চটে ব'ললো, সত্যিই ওর বাপ ওকে জামা এনে দেবে ভেবেছ নাকি ? —ছাই দেবে। কচি ছেলে—হাঁ ক'রে ব'সে আছে মাঠের দিকে চেয়ে— ধানকাটা শেষ হ'লে জামা পরবে। আমি আসবার সময় দেখি—খেজুর গাছে ঠেস দিয়ে মাথাটি গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছে বেচারী। আহা—

তারপর ওরা দু-জন এগিয়ে চললো। লক্ষ্মণ চুপ ক'রে হাঁটতে লাগলো।

হেমন্ত লক্ষ্মণের মুখের দিকে চেয়ে টিপি টিপি হেসে ব'ললো, আজ একটা তোমার খুব ভাল খবর শুনলাম। বুলা বাপের বাড়ী আসবে—খবরের পর খবর পাঠাচ্ছে: ধানকাটা শেষ হ'ল কি-না। নবান্নের সময়ে আনবে ব'লে কথা দিয়ে এসেছিল তার বাপ। ওঃ—কত দিন পরে দেখা হবে আবার, না? তোমার খবর নিয়েছে শুনলাম।

লক্ষ্মণ ব'লে উঠলো, দেখ দিকিন গরুটা কাদের ?

হেমন্ত ব্যস্ত হয়ে ব'ললো, আমাদেরই গরু তো।

লক্ষ্মণ ছুটে গেল, হেমন্তের ঠেস-মারা কথা থেকে যেন বাঁচলো। গরুটা মাঠে নেমে গিয়েছে তখন। লক্ষ্মণ টেনে আনতে আনতে দু-একগাছা ধানগাছ মুখে ছিঁড়ে এল গরুটার। লক্ষ্মণ তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে ব'ললো, খাবি, খাবি—তুইও খাবি পেট ভ'রে, আমরাও খাব। আর দু-দিন সবুর কর।

হেমন্ত হাসতে হাসতে ব'ললো, তার চেয়ে দু-জনেই মাঠে নেমে চলে যাও, খেয়ে এসো। তোমাদের যা মতিগতি, ও ধান আর ঘরে উঠবে না।

দুপুরে কাস্তের বাঁট তৈরী করতে বসলো লক্ষ্মণ রোদে পিঠ দিয়ে, আর অনেক বার মনে পড়লো বুলার কথা। বুলা আসবে—অনেক দিন পরে আবার দেখা হবে তার সঙ্গে তাহ'লে।

···ধান কাটা শেষ হবে কবে ? কি ক'রছে রায়েরা ?···

গ্রামান্তরের গুটিতিনেক রাস্তা এসে মিশেছে লক্ষ্মণের সুমুখে। একপাশ ঘেঁষে একটি বটগাছ ঠাণ্ডা কালো ছায়া ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে—বটগাছের কোলে অনেকখানি জায়গা ভরে আছে সবুজ ঘাসে। গুটি কয়েক ছোট ছোট ছেলে গরু নিয়ে এসেছে সেখানে চরাতে। তারা গরু ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্মণের কাস্তের বাঁট তৈরি দেখছে।

একটি ছেলে ব'লে উঠলো, এবার মাঠের পুকুরের মাছধরা হবে না লক্ষ্মণ কাকা ?

লক্ষ্মণ বলে, হবে বৈ কি।

আর সেই রকম খাওয়া ?

হয়ত জলার পুকুরধারেই হবে।

মাঠের মাঝখানে অনেক দূরে সে পুকুর। ছেলেগুলি সব একসঙ্গে মাঠের দিকে তাকালো : জলার সেই পুকুরের ধারে সারি সারি বাবলার গাছ—বাবলা-বন ভরে গিয়েছে হলদে ফুলের বন্যায়। মাছরাঙা আর নীলকণ্ঠ পাখী ডিম পাড়ে সেখানে—খড়হাঁস সাঁতার কাটে। কেমন রহস্যময় দেখায় ধানবনের মাঝখানে জায়গাটা।

জলার পুকুরগুলির মাছধরা নিয়ে গ্রামের ছেলেবুড়ো সবাই গিয়ে জোটে—ভাগ আছে সকলের। পুকুরের পাড়ে রান্না করে খায় একদিন ওরা উৎসব ক'রে—আর হট্টগোল করে। অল্প আয়োজন আর অফুরন্ত আনন্দের কলরবে নীল আকাশের নিচে একটি দিন।

লক্ষ্মণ আড়মোড়া ভেঙে ব'ললো, দেখিস, মাঠে যেন গরু না গিয়ে পড়ে।

লক্ষ্মণের কেমন ঝিমুনি আসছিল—রোদে পিঠ দিয়ে সে শুয়ে পড়লো। অনেকক্ষণ ঘুমলো সে। শীতের বিষন্ন বেলা শেষ হয়ে এল এক সময়ে।

হেমন্ত জল নিয়ে ফিরছিল অল্পবয়সী গুটিকয়েক মেয়ের সঙ্গে। ঘুমন্ত লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে একটি মেয়ে ব'লে উঠলো, হিমিদি, দেবো জল ছিটিয়ে ?

দে। ব'লে হাসতে লাগলো হেমন্ত। ব'ললো, ঘুমোবার আর জায়গা পায় নি ও, গাছতলায় এসেছে।

আর একটি মেয়ে বলে, আহা, হিমিদির কষ্ট হচ্ছে গো। ব'লে সে জল ছিটিয়ে দিল।

লক্ষ্মণ চোখ ঘষতে ঘষতে উঠে বসলো। মেয়েরা তখন হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়েছে অনেকটা।

লক্ষ্মণ হাই তুলে কাস্তের বাঁটগুলো নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কামার-বাড়ি যেতে হবে তাকে।

রাত ঘণ্টা-দুই হয়েছে। গিরিশের ছেলে বনমালী ফিরে এল ঘরে।

গিরিশ ব'ললো, কোথায় ছিলি রে?

কোথাও না—এই—এমনি একটু—

বনমালী তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে ঢুকলো। গিরিশের মুখে নিঃশব্দ আনন্দ-উজ্জ্বল একটা হাসির ঢেউ ভেঙে পড়লো। মনে মনে বলে সে, শীতের মধ্যেই বিয়ে চুকিয়ে ফেলতে হবে বনমালীর।

সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটি কেশরগাঁয়ের। কাল রাত্রির মধ্যেই মাঠ খালি হয়ে যাবে। কাস্তে সব তৈরি শেষ। তার পর একটি সুন্দর মেয়ে আসবে ঘরে ক-দিন পরে, বনমালী বসবে কামারশালে—তার পর?···তার পর কচি ছেলেমেয়েগুলি—

সারাদিনের কর্মক্লান্ত গিরিশ তার মুখ থেকে মুক্ত তামাকের কুণ্ডলীকৃত—ধোঁয়ার মত ঘুরতে লাগলো ভবিষ্যতের স্বপ্নলোকে।

···বিশ্রাম—শান্তি—অবসর।···

গিরিশের ঝাপসা চোখের সুমুখে অন্ধকারে কে একটি লোক এসে দাঁড়ালো। ব'ললো, গিরিশ আছে?

হ্যাঁ—কে! গিরিশ চমকে সচেতন হয়ে উঠলো।

ম্যানেজার বাবুর ডাক আছে। লোকটি নীরস কঠোর কণ্ঠে ব'ললো।

চৌধুরীবাবুদের ম্যানেজারের ডাক। বিচলিত হয়ে পড়লো গিরিশ। রায়-বাবুদের আশ্বাসবাণী মনে পড়লো একবার তার—তার পর অন্ধকারে হতাশ ভাবে সে লোকটির দিকে তাকালো। ভয়ে ভয়ে ব'ললো, কেন?

জানি নে। যেতে হবে।

কি ক'রবে গিরিশ ভেবে পেল না। শুধু কোথাও ছুটে পালাতে ইচ্ছে হ'ল তার। কিন্তু গিরিশ যেতে নারাজ হয় যদি, তা হ'লে জোরে ধরে নিয়ে যাওয়ার হুকুম নিয়ে এসেছে লোকটি? শুনে গিরিশ আরও ভয় পেয়ে গেল। হতাশ ভাবে তাকাতে লাগলো সে চারদিকে। ভীরু চোখ মেলে দেখলো সে: একটি লোক ছিল, আরও দুটি লোক নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

নিরুপায় গিরিশ উঠে দাঁড়িয়ে ঢোক গিলে ব'ললো, চল।

লোক ক'টি নিঃশব্দে অনুসরণ ক'রে চললো গিরিশকে। যেতে যেতে পাকা ফসল-ভরা অন্ধকার মাঠের দিকে তাকিয়ে গিরিশ শুধু ভাবতে লাগলো: রায়-বাবুদের রাতারাতি ধান কেটে ফেলার খবরটা কেমন ক'রে পেল চৌধুরীরা!

যেমন ক'রে হোক চৌধুরীরা জানতে পেরেছে। তারা জেনেছে, গিরিশের কামারশালে ভিন্ গ্রামের কাজের ঠেলা নয়, রায়েদেরই কাস্তে তৈরী ক'রছে সে। স্বয়ং বরদা চৌধুরী এসেছে মহালে।

ম্যানেজার দেঁতো হাসি হেসে ব'ললো, কি রে গিরিশ, ক-শ' কাস্তে হ'ল? রায়েরা সব প্রজা হাত ক'রে ফেলেছে ভেতরে ভেতরে—না? নিমক্‌হারাম, ছোটলোক।

গিরিশ নীরব।

বরদা চৌধুরী গম্ভীর কণ্ঠে ব'ললো, ক-শ' কাস্তে হয়েছে?

গিরিশ কম্পিত কণ্ঠে ব'ললো, শ-খানেক।

হুঁ। চৌধুরী কঠোর দৃষ্টিতে গিরিশের দিকে তাকিয়ে ব'ললো, আমার লোক যাচ্ছে—ওগুলো সব নিয়ে আসবে। আর ভূপতি, তুমি যাও—বসে

সড়কির ফলা কিছু তৈরী করে নিয়ো এই সঙ্গে। আজ রাত্রের মধ্যেই।...গিরিশের মুখের দিকে তাকিয়ে চৌধুরী ব'ললো, বুঝলে? আমার লোক খুব ভোর ভোর গিয়ে নিয়ে আসবে ওগুলো।

তার পর ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে ব'ললো, লোকজন সব ঠিক তো তোমার?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

চোখের ইঙ্গিতে গিরিশকে দেখিয়ে চৌধুরী ব'ললো, ওকে আর যা বলবার ব'লে দাও।

গিরিশকে সঙ্গে নিয়ে ম্যানেজার চলে গেল।

গিরিশের অন্ধকার কামারশালে আগুন গন্ গন্ ক'রে জ্বলে উঠলো আবার। আগুনে ঝুঁকে-পড়া ক্লান্ত মুখটা তার লাল হ'য়ে উঠলো পোড়া লোহার মত। স্তব্ধ গভীর রাত্রির বুকে হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগলো—ঠন্ ঠন্ ঠন্।

ভোরের আগেই শেষ হ'য়ে গেল কাজ। সড়কির তীক্ষ্ণ ফলাগুলো লুকিয়ে রাখা হ'ল ধানের ভেতরে। বস্তার মধ্যে চালান যাবে সকালে। গিরিশ স্থির-দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে কপালের ঘামের বিন্দু ক'টি মুছে নিল।

...মাঠের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছ—বিড় বিড় ক'রে কি যেন বলে লক্ষ্মণ।—গিরিশ তবু কাস্তে দেবে না। তারপর হেমন্তের ঠেলা খেয়ে জেগে উঠে বসলো সে।

লক্ষ্মণ হাই তুলে ব'ললো, স্বপ্ন দেখছিলাম। রাত বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে—না রে?

এই দুপুর রাতে তোমার রাত শেষ হয়ে এল!

না না, কি বলছিস! দেখি একবার—

লক্ষ্মণ বাইরে এসে তাকালো আকাশের দিকে। গভীর নিঃশব্দ রাত্রির তারায় ভরা আকাশে শুকতারা ওঠে নি তখনও। লক্ষ্মণের পরিচিত বড়

তারা'টি সবে নারকেল গাছের মাথার ওপরে ঝলমল করছে। ঠাণ্ডা উত্তুরে বাতাসে দূর মাঠের ধান বনের ক্ষীণ মর্মর শব্দ কানে এসে লাগে লক্ষ্মণের—আর বহু দূর থেকে ঠন্ ঠন্ লোহা-পেটার শব্দ। খুশিতে দুলে উঠলো তার মন। আর একটি দিন, আর একটি রাত। তার পর মাঠের ধান ঘরে উঠবে। শিস্ দিতে দিতে ঘরে ঢুকলো লক্ষ্মণ। ঘরে এসে আলো জ্বালালে। তার পর বিছানার এক প্রান্তে গুটিসুটি মেরে ব'সে ভাঙা গলায় গুন্ গুন্ ক'রে গান ধরলো।

হেমন্ত ব'ললো, তার মানে! এই দুপুর রাতে আলো জ্বেলে ব'সে ব'সে গান গাইবে নাকি!

হুঁ হুঁ। শীতে গলা কেঁপে উঠলো একটু লক্ষ্মণের। গুন্ গুন্ ক'রে ব'ললো, গন্ধতেল আর নীল ডুরে শাড়ী—

হেমন্ত ফুঁ দিয়ে আলো নিভিয়ে দিল।

দিলি নিভিয়ে! হাই তুলে লক্ষ্মণ ব'ললো, বড্ড শীত—তবু একটু গরম ছিল ঘরটা।

শুয়ে পড়—গরম হবে। অন্ধকারে হেমন্তের একটি হাত এগিয়ে এল নিবিড় হয়ে। হেমন্ত বলে, ধানকাটা তো শেষ হয়ে যাবে দু-এক দিনের মধ্যে। তার পর তোমার একটা গায়ের চাদর কিনে এনো।

খরচ আর অনেক প্রয়োজন। লক্ষ্মণের লঘু উত্তপ্ত মন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়—বলে, এ বছর আর হবে না। কাটিয়ে দেবো কোনোরকমে।

এই শীতে? নাই বা হ'ল আমার শাড়ী। কিনতে হবে না।

আমার খুশি আমি কিনবো। এক গাদা খরচ—অন্যমনস্ক লক্ষ্মণ বলে, চাদর কেনা হবে না এবার।

হবে হবে। খরচের ভয়ে ম্রিয়মাণ লক্ষ্মণকে উৎসাহিত ক'রে বলে হেমন্ত, কিছু ভাবতে হবে না তোমাকে, আমি ঠিক চালিয়ে নেব।

কি ক'রে চালিয়ে নেবে হেমন্ত, ভেবে পায় না লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের নিস্পন্দ হিম নিস্তব্ধতাকে হেমন্ত উচ্ছল হাসিতে চঞ্চল ক'রে তুলতে চায়। খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ব'লে, কি হ'ল! ব'ললুম না, ভাবতে হবে না।

ভাবতে হবে না লক্ষ্মণকে, তাকে ভাবতে দেবে না হেমন্ত। দুশ্চিন্তাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের হিমেল নিরুৎসাহতা থেকে নিজের বাধাবন্ধনহীন উদ্দাম আনন্দে লক্ষ্মণকে যেন হালকা পালকের মত উড়িয়ে নিয়ে যাবে হেমন্ত। সে একটি পুরুষকে ভালবাসে —যে তাকে দেবে গন্ধতেল আর শাড়ী। লক্ষ্মণকে কিছু ভাবতে দেবে না সে।

লক্ষ্মণের যখন ঘুম ভাঙলো, তখন ভোর হয়ে গিয়েছে।

ক্ষুব্ধ লক্ষ্মণ ব'ললো, রাত থাকতে ডেকে দিলি নে একটু—

সারা রাত গিরিশ হাতুড়ি পিটেছে। গভীর রাত্রে শুনেছে তার ঠন্ ঠন্ আওয়াজ। কাস্তে সব তৈরি—হয়তো নিয়ে চলে গিয়েছে সকলে। লক্ষ্মণ তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়লো।

পায়রা আর সারসের ঝাঁক নেমেছে মাঠে। লক্ষ্মণ হাত উঁচিয়ে ধরতেই ঝটপট ডানার শব্দ ক'রে উড়ে গেল সব। লক্ষ্মণ হন্ হন্ ক'রে হাঁটতে লাগলো। শুকনো খড়ের অদ্ভুত একটা গন্ধ এসে লাগছে নাকে তার। উত্তুরে হাওয়ার ঝলকে ধানের শীষগুলি ঝর্ ঝর করে উঠছে. বহু দূর থেকে বহু দূরে—কানে এসে লাগছে লক্ষ্মণের। চোখে তার হেমন্ত, কাস্তে আর ধান।

গিরিশের কামারশালের সুমুখে একটু থমকে দাঁড়ালো লক্ষ্মণ। দু-একটি পরিচিত মুখ দেখবার আশা করেছিল সে—কিন্তু কাউকেই দেখতে পেল না। নিস্তব্ধ গিরিশের ঘর, দরজা খোলা। উঠনে নতুন ধান জড়ো করা হয়েছে এক জায়গায়। ধানের স্তূপের পাশ দিয়ে ডিঙিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ্মণ হঠাৎ 'উঃ' ক'রে পা চেপে বসে পড়লো।

— বাপ রে! এখানে আবার কি রেখেছ গিরিশ-দা?

একটা সড়কির ফলা টেনে বার করলো লক্ষ্মণ। ব'ললো, এটা ধানের মধ্যে কেন?

লক্ষ্মণের পায়ে রক্তের ধারা। কাঁচা সোনার মত ধানগুলি লাল হয়ে গেল রক্তে—খানিকটা মাটিও। গিরিশ শুধু নিঃশব্দে সেই দিকে তাকিয়ে রইলো।

১৩৪৭
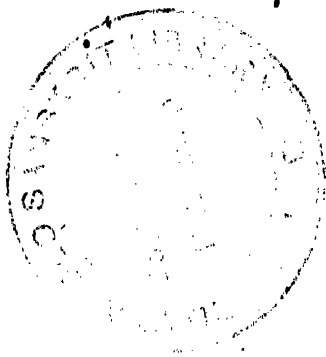
বিষ

আদিত্য ডাক্তারী পাশ ক'রে গ্রামে এসে প্র্যাকটিস শুরু ক'রবে—এ তার কোনো শুভার্থীই কল্পনা করে নি। তারা যখন অনুযোগ ক'রলো—তখন আদিত্য ব'ললো, দেশের সেবা ক'রবো। গ্রামে একটা ভালো ডাক্তার নেই—সত্যি কথা। গরীব শুভার্থীরা ব'ললো, ভালোই হ'ল। আদিত্যর শুভ কামনা আর প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো।

বনমালী অর্থাৎ ডাক্তারখানার বয় এবং বেয়ারা। সে ব'ললো, আমি কিন্তু মারা গেলাম বাবু। গরীবের এতেও মরণ, ওতেও মরণ।

কম্পাউণ্ডার শুনে ব'ললো, কেন? ভয় কি—মরবি কেন? দেখি তোর পিলেটা কত বড়। ব'লে হাত বাড়ালো বনমালীর পেটের দিকে। ব'ললো, বেড়ে গাঁ বাওয়া তোদের—সকলেরই পিলে—যে দিকে চাই! পেটের দিকে চেয়ে ব্যাটাছেলে-মেয়েছেলে ঠাওর করবার যো নেই। দেখি তোরটা—

পিলে-টিলে নয় বাবু—

তবে?

বনমালী বলে তার ঘনায়মান আর্থিক মৃত্যুর কথা। তার তিন-চার বছরের খাজনা বাকী, নতুন বিয়ে ক'রেছে টাকা ধার-ধোর ক'রে, ডাক্তারখানায় আবার

মাইনের আশা নেই। আদিত্য ডাক্তারের বাবা নারায়ণ দেব জমিদার লোক —তার নগণ্য আশ্রিত প্রজা সে, অনুগতজন। ঋণের টাকা উশুলের জন্যে বনমালীর ডাক্তারখানায় চাকরী। বেতন আনতে গিয়ে এই কথা শুনে সে আস্তে আস্তে চলে এসেছে।

কিন্তু রোজের পেট এখন চালাই কি দিয়ে?

এর কোন ওষুধ জানা নেই কম্পাউণ্ডারের। চুপ ক'রে হাত গুটিয়ে সে ব'সে রইলো। লোকটা হাল্‌কা মেজাজের, শুনে গম্ভীর হ'য়ে গেল।

ডাক্তারখানায় ডাক্তারও নেই—আর কোনো লোকজনও নেই। জলার ওপাশে উঁচু ক্ষেতে হল্‌দে সর্ষে ফুলের বন্যা। বনমালী সেই দিকে তাকিয়ে ব'ললো, এর চেয়ে চাষ-আবাদ করাই ভালো ছিল বাবু, মিথ্যা তখন টাকার মোহে পড়ে—

হাই তুলে মুখ বিশ্রী বিকৃত ক'রে কম্পাউণ্ডার ব'ললো, মন-মেজাজ খারাপ ক'রে দিলি রে। কম্পাউণ্ডার আড়মোড়া ভাঙলো—লিক্‌লিকে সরু লম্বা দেহটা অধিকতর লম্বা আর সরু দেখায়। ব'ললো, কাল থেকে শরীরটাও বড় খারাপ।

বনমালী সহৃদয়তার প্রতিদানে ব'ললো, আপনি আবার বড় রোগা বাবু। কত ভালো ভালো ওষুধ-পত্তর ঘাঁটেন—তাতে কত লোকের ভালোও হচ্ছে ধরুন, আপনার কিন্তু—

কম্পাউণ্ডার ব'ললো, ওই পাঁচ রকম ওষুধ ঘেঁটে ঘেঁটেই তো চেহারাটা খারাপ হ'য়ে গেল রে বাওয়া। ব'লে ব্রণের কালোচিহ্নবহুল ফর্সা তোবড়া গালে হাত বুলোতে লাগলো। ব'ললো, পাঁচরকম বিষাক্ত ওষুধের ঝাঁঝে দেহটা দিলে একেবারে সাবাড় ক'রে।

বনমালী শুধু হাসে মাথা নেড়ে নেড়ে।

কম্পাউণ্ডার ব'ললো, বিশ্বাস হ'চ্ছে না—না? জানিস, কি রকম বিষ নিয়ে সব ঘাঁটাঘাঁটি ক'রতে হয়! এমন বিষ আছে যে, একটুখানি অমনি মুখে দিয়ে একটা সায়েব শুধু মাত্র লিখে যেতেই পারলো না—তার স্বাদটা কেমন। তার

গন্ধ নিলেই বাস্‌···ওই আলমারীতে আছে, ওই যে বড় বোতলটার পাশে। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল কম্‌পাউণ্ডার।

এমনতর সাংঘাতিক আবহাওয়ায় কেমন ক'রে কাটাতে পারলো সে—কত-দিন খুলেছে ওই আলমারী! ভগবানকে ধন্যবাদ, বনমালী মরে নি। বনমালী সভয়ে চেয়ে রইলো।

কম্‌পাউণ্ডার খোঁচা দিয়ে ব'ললো, বিশ্বাস হচ্ছে না তবু, না? ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেসা করিস, পোটাসিয়াম সায়ানাইডটা কি চিজ। বুঝলি?

নামটাও দীর্ঘ ও গালভরা। বনমালী শুধু খানিকটা হাঁ ক'রলো।

এমন সময় একটি লোক ছুটতে ছুটতে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে কম্‌পাউণ্ডারের হাতে একটা কাগজ ধরে দিয়ে ব'ললো, ডাক্তারবাবু কাগজটায় যা যা লিখে দিয়েছেন, তাই নিয়ে ফুর্তি আপনাকে যেতে ব'ললেন। কৈলাশের বৌ কষ্ট পাচ্ছে।

বটে! কষ্ট পাচ্ছে! কিন্তু কষ্ট পাওয়ার তো তার কথা নয়। কম্‌-পাউণ্ডার কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বলে, শুনলুম তিন বছরে তার পাঁচ-পাঁচটা ছেলে হ'য়েছে, ছটায় গড়াবে এবার—কষ্ট কিসের! এ যে খাওয়া শোয়ার মত সহজ ক'রে ফেলেছে রে!

পোয়াতি মানুষ, এবার বড় কাহিল ক'রে ফেলেছে বাবু, কেমন হল্‌দে হ'য়ে গেছে।

সেত হবেই বাওয়া, বয়স মেরে কেটে তেইশ পেরোবে না। নেচার্‌শ রিভেঞ্জ একটা আছে তো, বুঝলি।···

তা বৈ কি বাবু, বুঝি সব···

কম্‌পাউণ্ডার বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ব'ললো, কচু বুঝেছিস। চল্‌ চল্‌ ও বনমালী, ওই আলমারী থেকে তুলোর বাণ্ডিল নে কাঁড়ি খানেক। নে চট্‌ পট্‌।

বনমালী কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো: তুলো আর পোটাসিয়াম সায়ানাইড একই আলমারীতে। নতুন বিয়ে ক'রেছে বনমালী আর এমন সুন্দর পৃথিবী, ও

আলমারীর পাশও ঘেঁষবে না সে আর কোনোদিন। অমন সাংঘাতিক বিষ! ··· জীবনটা কতো সুন্দর, আজ প্রথম গভীরভাবে উপলব্ধি ক'রলো যেন সে।

কম্পাউণ্ডার ধম্কে ব'ললো, শিশিতে ছিপি আঁটা আছে তো! তবু কি ছুটে বেরিয়ে এসে তোর মুখে ঢুকে যাবে!

বনমালী তবু নড়লো না। অগত্যা গালাগালি দিতে দিতে কম্পাউণ্ডার জিনিস-পত্র গুছিয়ে চলে গেল। বনমালী সোজা চলে এল ঘরে। ভাবলো, কি সাংঘাতিক বিষ আর সুন্দর পৃথিবী।···আর জীবন। একটি মেয়ে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, শান্তি আর আনন্দ জড়ো ক'রে রেখেছে তার জন্যে।

শহর থেকে নতুন আনা আদিত্য ডাক্তারের দামী কৌচের চেয়ে ঢের নরম তুল্‌তুলে কন্‌কি। বনমালী টাকা ধার ক'রে তাকে ভিন্‌গ্রাম থেকে বিয়ে ক'রে এনেছে। আর সেই ধারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঠাকুরদাস আদালতের সাহায্য গ্রহণ ক'রেছে। তার আসার সময় হ'লো। বনমালীর টাকার দরকার। জীবন উপভোগের মূল্য আছে, সে উপভোগের মূল্য দিতে হবে ঠাকুরদাসকে।

কিন্তু শোধের আশা নেই, উপায় নেই—কেউ টাকা দেবে না বনমালীকে। যাদের টাকা আছে তারা যেন এক যোগে ষড়যন্ত্র ক'রে বসলো বনমালীর বিরুদ্ধে। মনিব নারায়ণ দেবও তার মধ্যে একজন। নিরুপায় বনমালী অগত্যা খোরাকী ধান যা ছিল—তাই দিলো বেচে। তবু কিছু টাকা কম পড়লো।

কম্পাউণ্ডার ব'ললো, খাবি কি? মাইনের টাকা তো কাটা যায়।

চাকরী ছেড়ে দিয়ে এবারে বরং কারুর চাষ-আবাদে মজুর খাটবো বাবু।

কথাটা আদিত্য ডাক্তারের কানে গেল—তারপর নারায়ণের কানে। বর্ষা শুরু হ'য়েছে—লোকজন সকলে চাষে নেমে গিয়েছে। বনমালী যদি চাকরী ছাড়ে তা হ'লে এমন দিনে লোক আর পাবে না আদিত্য। অথচ ডাক্তারখানায় চাকর একজন নিতান্ত প্রয়োজন।

আদিত্য ব'ললো, ভারী মুশকিলেই পড়লুম দেখছি এখন!

নারায়ণ ব'ললেন, মুশকিল আবার কিসের। চাকরী ক'রবে না ব'ললেই হ'লো। আমার জমির খাজনার টাকা শোধ হবে কিসে!

নারায়ণ বনমালীকে ডেকে পাঠালেন।

বনমালী এল, নিজের অবস্থা গুছিয়েই ব'ললো—কিন্তু তাতে নারায়ণ বড় বেশী আগোছাল হ'য়ে পড়লেন। বনমালীর মত লোকের স্পর্ধিত স্পষ্ট কথা শোনার মতো ধৈর্য বা অভ্যাস তাঁর নেই। চোয়াল যখন ব্যথায় টন্ টন্ ক'রে উঠলো আর দাঁতের পাটি থেকে রক্ত ঝরে পড়লো—বনমালী তখন বুঝলো কথাটা। বুঝে এল : চাকরী তাকে ক'রতেই হবে বাকী খাজনার টাকা শোধের জন্যে, অথবা নিরাশ্রয় নিরবলম্ব। না, বনমালী তা ভাবতে পারে না। বাইরের বিস্তৃত পৃথিবীর সঙ্গে সে পরিচিত নয়। সেই গ্রামের পরিচিত সীমান্তটুকু নিঃস্বতায় ধূ ধূ ক'রতে লাগলো তার মনের মধ্যে।

হঠাৎ সেইদিন বিকেলের দিকে তার কুঁড়ে ঘরের চালার কাছে আদিত্য ডাক্তারকে দেখা গেল। শশব্যস্তে ছুটে এল বনমালী। কন্‌কি গায়ের ছেঁড়া কাপড়টা এদিক-ওদিক টানাটানি ক'রে নগ্নতাকে আরও সুস্পষ্ট ক'রে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। আদিত্য লোভী দৃষ্টিতে চোখের কোণে তাকিয়ে আছে তার দিকে : ড্যাব ড্যাবে দুটো চোখ মিলে আড়চোখে দেখে কন্‌কি। তার-পর হঠাৎ যেন তার হাসি পায়।

আদিত্য বনমালীকে ব'ললো, ডাক্তারখানায় আজ গেলি নে যে তুই ?

কাল থেকে যাবো বাবু।

হ্যাঁ যাস্। তোকে ভাবতে হবে না, বুঝলি।

আদিত্যর হঠাৎ তারপর তৃষ্ণা পেয়ে গেল—ব'ললো, তোর বউকে একটু খাওয়ার জল আন্‌তে বল দেখি। কথাটা চেঁচিয়ে বলে আদিত্য। মেয়েটাকে আবার দেখতে ইচ্ছে হয় কেন যেন : বেশ আঁট-সাঁট মেয়েটি।

বনমালী ব্যস্ত হয় নিজেই জল আনতে যাচ্ছিল—এমন সময় দেখা গেল, কন্‌কি জল নিয়ে আসছে। আদিত্যর নিঃশব্দ হাসির ঝলক পড়ে এবার কন্‌কির

দুটো চোখে। আদিত্য জল খেতে খেঁতে ব'ললো, বাবাকে আমিও ব'লবো···আর —আদিত্য চোখের কোণে তাকালো একবার কন্‌কির দিকে—ব'ললো, আর তোর বৌকেও সন্ধ্যের পর আজ পাঠিয়ে দিস একবার। কেঁদে কেটে পড়লে একটা উপায় হবে। হাজার হোক মেয়েমানুষের কান্না···

জলের গেলাস নিয়ে কন্‌কি ঠোঁট কামড়ে মুখ নিচু ক'রে চলে গেল।

তারপর আদিত্য চলে গেল শিস্‌ দিতে দিতে।

তখন থেকে বনমালী উপদেশ দিতে শুরু ক'রলো কন্‌কিকে: কেমন ক'রে তার. কেঁদে পা জড়িয়ে ধরা উচিত, কেমন ক'রে বলা উচিত দুঃখ দুর্দশার কথা ইত্যাদি। এ চললো সন্ধ্যা পর্যন্ত।

আবার ব'ললো, একখানা ছেঁড়া-ময়লা দেখে কাপড় পরে যাস, বৌ, বুঝলি ?

কিন্তু কি বুঝলো কন্‌কি, কে জানে। যাওয়ার জন্যে যখন সে বেরুলো তখন দেখা গেল, পরণের শাড়ী তার ছেঁড়া নয়, চুলগুলি পরিপাটি করে বাঁধা, মুখে আর মাথায় তেল চবচব ক'রছে।

বনমালী ক্ষুব্ধ হ'য়ে ব'ললো, ওই বেশে গিয়ে দাঁড়ালে কোন লোকের দয়া হয়! এত করে বল্লাম তোকে—

মুখ ভার হ'য়ে গেল কন্‌কির। একবার বেঁকে বসে যদি সে, তা হ'লে মুশকিল। বনমালী আর কিছু ব'লতে সাহস পায় না। কন্‌কি সেই বেশেই গেল। যাওয়ার সময় বনমালীর কাছে থেকে ফের একবার উপদেশগুলো শুনে গেল।

আদিত্যের স্ত্রী রমা। ঢলঢলে খাটো আদুরে চেহারা। ভয়ে সে থমকে দাঁড়ালো অন্ধকার করিডোরের মাঝখানে। আদিত্যর ঘরের দিকে যেতে আর পা উঠলো না। আদিত্যর ঘরটা আবার দক্ষিণের কোন ঘেঁষে এক প্রান্তে। রমা সভয়ে দেখলো: সর্বাঙ্গে কাপড়মোড়া একটা অস্পষ্ট মূর্তি সন্তর্পণে

আদিত্যর ঘর থেকে বেরিয়ে খিড়কির দিকে অন্ধকারে মিশে গেল। কিছুক্ষণ গলা দিয়ে তার কথা সরলো না। তারপর ভয়ে ভয়ে ব'ললো, কে!

কোন উত্তর নেই।

'চোর চোর' ব'লে রমা চেঁচিয়ে উঠলো তারপর।

বাড়ীর দাস-দাসী, স্বয়ং নারায়ণ পর্যন্ত ছুটে এলেন। লণ্ঠন হাতে জন কয়েক লাঠি-সোঁটা নিয়ে খিড়কির দিকে ছুটলো। রমা আদিত্যের ঘরে ঢুকলো। আশ্চর্য, এত চেঁচা মেচিতেও দিব্যি ঘুমোচ্ছে আদিত্য। তাকে ডেকে তুললো রমা।

রমা সন্দিগ্ধ কণ্ঠে ব'ললো, কিছুক্ষণ আগে দেখে গেলাম—তোমার ঘরের দরজা বন্ধ, আবার খুললে কে?

আদিত্য ঘুমজড়িত কণ্ঠে ব'ললো, কেন আমি। মানে ইয়ে···তুমি এসে ফের ডাকাডাকি ক'রে বিরক্ত ক'রবে তাই খুলে দিয়েছিলাম। কেন কি হ'য়েছে?

কিছু জানো না তুমি?

বাঃ, কি ব'লছো তুমি, কি জানবো!

তোমার ঘরে চোর ঢুকেছিল, বোধহয় কোন মেয়েমানুষ।

এ্যাঁ, মেয়ে চোর! কই আলো নিয়ে এসো তো! আদিত্য অধৈর্য হ'য়ে নিজেই দেশ্লাই জ্বালালো।

কিন্তু সমস্তই ঠিক আছে। আদিত্য চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখ্‌লো! রমা শুধু একবার তাকালো কুঞ্চিত বিধ্বস্ত বিছানাটার দিকে। তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে ব'ললো, সত্যি বলো—কিছু জানো না তুমি—কিছু জানো না!

বারে, কি জান্‌বো।

না না, কিছু না···কিছু না। আমিই ভুল দেখেছিলুম···

তাই হবে। অন্ধকারে ওরকম ভুল মানুষের মাঝে মাঝে হয়। কই কিছুই তো চুরি হ'য়েছে ব'লে মনে হচ্ছে না।

না, জিনিস-পত্র তো তোমার ঠিকই আছে। কিন্তু তবু কিছু একটা গেল বোধহয়, যা আর পাওয়া যাবে না।

রমা দ্রুত সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিশ্বাস! মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা! গম্ভীর মুখে কয়েক মুহূর্ত শুধু ভাবলো আদিত্য তারপর হাস্‌লো। সে হাসি ওই নিঃশব্দ অন্ধকারের মত! তারপর বিছানায় আবার শুয়ে পড়লো সে।

কন্‌কি এসে ঘরে ঢুক্‌লো।

বনমালী জিজ্ঞেস ক'রলো, অতো হাঁপাচ্ছিস্ কেন?

কে একটা লোক—মস্ত কালো চেহারা, বনের মধ্যে গিয়ে ঢুক্‌লো। বাবুদের বাড়ী থেকে ওদিকে 'চোর চোর' ব'লে চেঁচাচ্ছে।

মরুক্ গে।

চোরের কাহিনী শোনবার জন্যে এতক্ষণ উৎসুক হ'য়ে ছিল না বনমালী। জিজ্ঞেস ক'রলো, কি হ'লো তারপর বল্। খুব কাঁদলি তো?

হুঁ-উ। নাক্ খুঁটতে খুঁটতে কন্‌কি ব'ললো, তিনটে টাকা দিয়েছে।

মাত্র তিন টাকা! কে দিলে?

ডাক্তার বাবুর বৌ, আসচি কাপড় ছেড়ে—দিচ্ছি।

কাপড় ছাড়তে গেল ঘরের মধ্যে কন্‌কি। আঁচলে বাঁধা পাঁচটা টাকার দুটো কাপড়ের পুঁটলির এক কোণে রাখলো গুঁজে। তারপর তিনটে টাকা নিয়ে বনমালীকে এসে দিলো।

বনমালী ব'ললো, কি হ'লো সব বল্। আমার মাইনের সম্বন্ধে কিছু ব'ললে?

না, ডাক্তারবাবুর বাবা ত চটে আগুন। শেষে ডাক্তারবাবুর বৌ ডেকে টাকা দিলে। কন্‌কি একটু থেমে আবার ব'ললো, মাঝে মাঝে দু-এক টাকা এমনি দেবে ব'ললে।

তাতে ক'রে কি হবে! অন্তত পাঁচটা টাকা আজ পেলেও কাল ঠাকুরদাসের সব টাকাটা শোধ ক'রতে পারতাম।

কন্‌কি চটে ব'ললো,তবে আমি কি ছিনিয়ে আনবো,না—চুরি ক'রে আনবো ?

বনমালী চুপ ক'রে গেল।

সকালে ঠাকুরদাসের টাকা মিটিয়ে দিতে গেল বনমালী।

ঠাকুরদাস টাকা গুণ্‌তে গুণ্‌তে ব'ললো, মামলা মোকদ্দমায় যে খরচা হ'লো—সেটা কে দেবে ?

বনমালীর চোখে জল না এলেও খানিকটা কান্নার ধরনে হাউমাউ ক'রে ব'ললো, গরীবকে রক্ষা করুন বাবু। ঘরের যা ছিল বেচে এনেছি—খাওয়ার একটি ক্ষুদ-কুঁড়োও নেই আর।

ঠাকুরদাস টাকা গোনা শেষ ক'রে ব'ললো, তা না হয় হ'লো—কিন্তু আসল থেকেই যে সাতটা টাকা কম্‌।

এই মাসের মধ্যেই দিয়ে দেবো বাবু। ডাক্তারখানায় চাকরি ক'রছি—মাইনে পেলেই দিয়ে দেবো।

উঁহুঁ, ওসব চল্‌বে না। ঠাকুরদাস টাকা ছুঁড়ে দিয়ে ব'ললো, নিয়ে যা তবে। আদালত থেকে যা হয় হবে।

বাবু—

উঁহুঁ—

ঠাকুরদাস পাহাড়ের মতো অনড়। অগত্যা কন্‌কির আনা সেই তিনটি টাকা দিতে বাধ্য হ'লো বনমালী। ভেবেছিল ঠাকুরদাসকে কোনো রকমে রাজী করিয়ে রাখবে তিনটি টাকা, তবু কিছু দিন চল্‌বে পেটখরচ। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও টাকা ক'টি তুলে দিলো ঠাকুরদাসের হাতে।

কিন্তু ঠাকুরদাস টাকা ফিরিয়ে দিয়ে ব'ললো, তিনটেই অচল—জাল টাকা, কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছিস ?

সে কি বাবু!

হ্যাঁ—ও চল্‌বে না।

বনমালী ছুট্‌লো আদিত্য ডাক্তারের অন্দর মহলে—রমার কাছে টাকা বদ্‌লে আনতে। কিন্তু রমাকে দেখে সে থম্‌কে দাঁড়ালো। রমার চোখ লাল, চুল উস্কো-খুস্কো—মুখ পাণ্ডুর। বনমালী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উস্‌খুস্‌ ক'রতে লাগলো।

রমা জিজ্ঞেস ক'রলো, কি চাই?

আপনার অসুখ?

না।

বনমালী তবু দাঁড়িয়ে রইলো।

—কিছু চাই?

—মানে ইয়ে···বনমালী মাথা চুল্‌কে ব'ললো, বৌকে কাল যে তিনটি টাকা দিয়েছিলেন—সে তিনটে টাকাই খারাপ।

রমা বিস্মিত দৃষ্টি মেলে বনমালীর দিকে চেয়ে রইলো। গত রাত্রির রহস্যাবৃত সমস্ত ব্যাপারটা ধীরে ধীরে তার কাছে প্রাঞ্জল হ'য়ে গেল। বনমালীর দিকে চোখ তুলে সে তাকাতে পারলো না—তবু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস ক'রলো, কাল টাকা নিয়ে গিয়ে কি ব'ললো তোর বৌ?

কন্‌কি যা ব'লেছিল তারই পুনরাবৃত্তি ক'রে গেল বনমালী। তারপর অচল তিনটে টাকা দেখিয়ে ব'ললো, আপনার এই তিনটে টাকা—

ওটাকা আমি দিই নি। তোর ডাক্তারবাবু তোর বৌকে দিয়েছে—তাকেই দিস্‌।

হতভম্ব বনমালী ফেরবার উপক্রম ক'রছিল, এমন সময় আদিত্য সেইখানে এলো। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বনমালীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলো, কিরে—কি চাই?

কাল বৌ যে তিনটে টাকা নিয়ে গিয়েছিল আপনার কাছে থেকে—

আমার কাছে থেকে! কে ব'ললো!

উত্তরোত্তর আদিত্যর গলা চড়তে লাগলো উঁচুর দিকে। একটা চড় পড়লো বনমালীর গালে—আবার একটা—তারপর অনেক। আদিত্য চিৎকার ক'রে ব'ললো, তোর বৌ টাকা চুরি ক'রেছে—তিনটা নয়—পাঁচটা, আর পাঁচটাই ছিল অচল টাকা। টেবিলের ওপরে ফেলে রেখেছিলুম আমি। ব্যাটা শয়তান—

রমা বনমালীর দিকে তাকিয়ে ব'ললো, তুই যা। তারপর আদিত্যর দিকে চেয়ে ব'ললো, চেঁচা-মেচি করে নিজের কেলেঙ্কারীর আর ঢাক পিটিও না।

আদিত্য রুখে দাঁড়ালো।

ওদের কুৎসিত কলহের মাঝখানে গত রাত্রির সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে যায় বনমালীর কাছে। তারপর নিঃশব্দে সে চলে আসে সেখান থেকে।

ঠাকুরদাসের টাকা রইলো পড়ে। এক পা এক পা ক'রে সে ঘরের দিকে ফিরে এল—হাতে সেই তিনটে অচল টাকা। হঠাৎ তার জীবনের ভিত যেন নড়ে উঠেছে—ভেঙে পড়ছে আস্তে আস্তে সব। কিছু আর ভালো লাগে না তার। তার মনে হয়—মর্মান্তিক একটা রহস্যের কিছু যেন বুঝেছে সে, সব জেনেছে সে—তবু কিছুই যেন তার জানা হয় নি। কন্‌কিকে সে কিছুই জিজ্ঞেস্ ক'রতে পারলো না। সারা দিন শুধু ছট্‌পট্ ক'রে কাটালো। হাজারো বার ইচ্ছে হ'লো, জিজ্ঞেস করে কন্‌কিকে। হাজারো বার সান্ত্বনা দিল নিজেকে, হয়তো কিছুই সত্যি নয়—হয়তো সত্যিই কন্‌কি টাকাটা চুরি ক'রেই এনেছে।

রাত্রি এল—সেই সুন্দর রাত্রি। কিন্তু কন্‌কির সমস্ত মাদকতা আজ কদর্যতায় সান্ত্বনা খুঁজতে লাগলো। সুন্দরতম যদি কিছু থাকে সে মেয়ে মানুষ আর কদর্যতম যদি কিছু হতে পারে—সে ওই ওরাই।

বনমালী ছট্‌পট্ ক'রতে লাগলো, তার ইচ্ছে হলো—কন্‌কিকে জাগিয়ে সব জিজ্ঞেস করে। তারপর কন্‌কি যদি সব স্বীকার করে—বনমালী যা সন্দেহ করছে, রমা যা ইঙ্গিত ক'রেছে—তা হলে? পাগলের মতো বনমালী নিজের চুল ধরে টানতে লাগলো—মাথা চেপে ঝিম্ হয়ে ব'সে রইলো কিছুক্ষণ।

···একটা জগৎ, একটা সুন্দর অবিশ্বাসী জগৎ ভেঙে গুঁড়ো হ'য়ে যাচ্ছে তার চোখের সুমুখে। ···

এক সময়ে কন্‌কিকে ডেকে তুললো বনমালী।

বনমালী জিজ্ঞেস ক'রলো, টাকা তোকে কে দিয়েছিল—সত্যি বল্।

থম্‌কে গেল কন্‌কি ভয়ে বনমালীর অস্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠে—এই রাত দুপুরে। ভয়ে ভয়ে ব'ললো, ডাক্তারবাবুর বৌ।

না। বনমালীর কর্কশ অস্বীকারে একটা হিংস্র পশু যেন ঋজু হ'য়ে দাঁড়ালো, ভেবেচিস্—কিছু জানতে পারবো না।

কন্‌কি নতমুখ।

বল্।

কন্‌কি নীরব।

বনমালী কন্‌কির একটা আঙ্গুল উল্‌টো দিকে চাপ দিতে লাগলো ক্রমশ; যন্ত্রণায় ছট্‌পট্ ক'রতে লাগলো কন্‌কি। বনমালী শুধু চাপা গলায় ব'ললো, বল—

উহুহু—ছেড়ে দাও ওগো—উহু, চুরি ক'রেছি আমি।

না! বনমালীর চোখ ধক্ ধক্ ক'রে জ্বলে উঠলো। তবু চাপ দিতে লাগলো সে।

উহু হু—চুরি ক'রেছি, ছাড়ো—ওগো।

চুরি ক'রেছিলি? সত্যি বল। বনমালী আরও জানতে চাইলো, স্বীকারোক্তি চাইলো, চাইলো সমস্ত প্রাঞ্জল হ'য়ে যাক, ভেঙে গুঁড়ো হ'য়ে যাক তার বিশ্বাসের সুন্দর জগৎটা।

···ভালো লাগে ভাঙতে। ···

তারপর কন্‌কির ফোঁপানির ভেতর দিয়ে সে জগৎ ভেঙে গেল বনমালীর। কেমন একটা পাশবিক পরিতৃপ্তি পায় বনমালী। বনমালী ব'ললো, তোর কাছে আরও দুটো টাকা আছে—দে।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে কন্‌কি টাকা বের ক'রে দিল। বাজিয়ে দেখলো—সে দুটোও অচল বটে।

বনমালী তারপর অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লো। ট্যাঁকে সেই অচল পাঁচটা টাকা। পুকুরের দিকে ছুঁড়ে দিল সেগুলো—নিঃশব্দ অন্ধকারে টুব্‌ টুব্‌ ক'রে শব্দ হ'লো। তারপর এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ালো। শুধু পাক খেতে লাগলো দুর্ভেদ্য যন্ত্রণাকাতর রহস্যের মধ্যে। তারপর নিজেরি ওপরে রাগ হ'ল তার : কেন জানলো সে এত কথা।

কম্‌পাউণ্ডার ঘুমোচ্ছিল—বনমালীর ডাকাডাকিতে উঠে দরজা খুলে দিল। ঘুমজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস ক'রলো, তুই এমন সময়ে যে রে! বৌ কি তাড়িয়ে দিলে বিছানা থেকে?

বনমালী শুধু ব'ললো, এইখানে শোব কম্‌পাউণ্ডার বাবু।

কেন—হঠাৎ?

বনমালী নিরুত্তরে একটা বেঞ্চি আশ্রয় করে শুয়ে পড়লো। কম্‌পাউণ্ডার শুয়ে পড়লো নীরবে :. হয়তো দাম্পত্য কলহের ব্যাপার।

বনমালী হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, বাবু ঘুমালেন?

না, কেন?

বনমালী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর ব'ললো, ভেবেছিলাম ডাক্তারবাবু ভালো লোক, কিন্তু সব মিথ্যে। ...

কম্‌পাউণ্ডার চটে ব'ললো, বেইমান কি-না। অতবড় একটা ডাক্তার, পসার-পয়সা সব ছেড়ে গাঁয়ে এসে বসলো দেশে ভালো ডাক্তার নেই ব'লে, পাঁচ জনের উপকার হবে ব'লে। তার নিন্দে করবি বই কি।

আপনি জানেন না বাবু—

খুব জানি। তোর বৌ ছেঁড়া কাপড় পরে লজ্জা পায়—গরীব লোক তুই, কাপড় দিতে পারিস না। আজই তো স্বচক্ষে দেখলুম—ডাক্তারবাবু আমাদের কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিলেন। তুই তার নিন্দে করবি বৈকি।

বনমালী অধৈর্য হয়ে উঠলো আবার নতুন অস্বস্তিতে: কাপড়ের কথাটা কেন শুনলো সে আবার! ব'ললো, গরীবের দুঃখ ওরা বোঝে না বাবু—বরং সর্বনাশ করে। তার …

চুপ কর্ চুপ কর্। সব বেইমান তোরা।

বনমালী চুপ করলো।

কিছুক্ষণ পরে কম্পাউণ্ডারের নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল, ঘুমিয়ে পড়েছে সে। বনমালীর ঘুম নেই, শুয়ে থাকতেই যেন তার অসহ্য মনে হচ্ছিল। কিছুই তার ভাল লাগছিল না। জীবনের এই বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকে দিনের পর দিন বেঁচে থাকতে হবে—একটা জ্বালা, একটা অবিশ্বাস নিরুপায় অসহায়ের মতো মনের মধ্যে পুষে দিন কাটাতে সে পারবে না। তার চেয়ে মরা ভালো—বিষ খেয়ে …সেই বিষ খেয়ে। ঠিক্। বনমালী এক মুহূর্তের মধ্যে ঠিক করে ফেললো সব।

আলমারীর চাবি কম্পাউণ্ডারের বালিশের কাছে পড়ে আছে। বনমালী পা টিপে টিপে গিয়ে চাবি নিয়ে এলো। একদিন যে আলমারীটাকে সে সব চেয়ে বেশী ভয় করতো—তারই পাশে সে আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালো। আলমারী খুললো সে—একটা দেশলাইএর কাঠি জ্বালালো সেই বড় বোতল, তার পাশে ওই শিশিটা—পোটাসিয়াম সায়ানাইড।

হাত কাঁপছে তার। বিষের শিশিটা সে হাতে ক'রে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো। এই গ্রাম—অনেক দিনের গ্রাম, ঘর, কন্কি, ডাক্তার, ঠাকুরদাস।… হু হু করে তারা ছুটে যায় চোখের সুমুখ দিয়ে।

সাংঘাতিক বিষ—নিজে খাবে, না কন্কিকে দেবে, না আদিত্য ডাক্তারকে দেবে, না ঠাকুর দাস—যারা তার সমস্ত পৃথিবীটা কেড়ে নিয়েছে? বনমালী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো।

১৩৪৭

ছোঁয়া

সস্ত্রীক গ্রামের বাড়ীতে আসছিল সুরেন। স্ত্রী তার চিরকাল ক'লকাতার কোনো একটা কানা গলিতে মানুষ। জনাকীর্ণ নগরী ছাড়া খোলা পৃথিবীর সঙ্গে কোনো পরিচয় এতদিন ছিল না তার।

স্টিমার থেকে নেমে সুরেন হেসে জিজ্ঞেস ক'রলো, কেমন লাগছে?

দূর নদী-পথ—যত দূর চোখ যায়, আকাশ আর পৃথিবী পাল্লা দিয়ে ছুটে গিয়েছে ঊর্দ্ধশ্বাসে। প্রমীলার সঙ্কীর্ণ মনের সীমানা ছাড়িয়ে মস্ত বড় আকাশটার নিচে পৃথিবী যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে ছুটেছে বহুদূর-বিসারী নদীর জলরাশি পেরিয়ে, ওপারের অস্পষ্ট নারিকেল গাছের সারির ওপরে ঝুঁকে-পড়া শাদা মেঘের সীমানা পেরিয়ে কত দূরে, কত অপরিচিত গ্রাম-গ্রামান্তরে, প্রমীলা যেন ধারণাও ক'রতে পারে না।

স্টিমার ঘাটের পাশ দিয়ে ক্যানেল চলে গিয়েছে। ক্যানেলের মুখে নৌকোর ভীড়, ধান বোঝাই নৌকো—খড় বোঝাই নৌকো—তেল, মশলা, এমনি বহু রকমের বোঝাই নিয়ে নৌকোগুলি অপেক্ষা ক'রছে। কোনটা বাইরে যাবে—কোনটা ঢুকবে ক্যানেলের ভেতরে, যাবে কোনো গঞ্জের হাটে। কয়েকটি নৌকোয় রাঁধা-খাওয়া চলছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে নৌকো থেকে। যাত্রী-বাহী

নৌকোও আছে কয়েকটি—হাঁক দিয়ে দিয়ে স্টিমার ঘাটে মাঝি-মাল্লারা যাত্রী যোগাড় ক'রছে। তাদের কয়েক জন সুরেনকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। দর কষাকষি ক'রছে সুরেন। প্রমীলা ব'সে আছে একটা বেডিংয়ের ওপরে।

অনেক কথা কাটাকাটির পর শ্রীনাথ মাঝির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত একটা রফা হ'ল। নৌকোয় মালপত্র তোলবার জন্যে শ্রীনাথ ডাকতে গেল তার ভাইকে।

কিন্তু মাত্র সাত টাকায় রফা হয়েছে শুনে ক্ষেপে উঠলো ভরত—ব'ললো, মাল বয়ে নিয়ে আয়গে তুই। যেতে হবে সেই কোথায় গোলাবাড়ীর হাট—একদিন এক রাতের পথ! সাত টাকায় কি ব'লে রাজী হ'লি তুই! তুই যা—আমি যাবো না।

শ্রীনাথ চোখ মিট্ মিট্ ক'রে চাপা গলায় ব'ললো, আরে রাজী হ'য়েছি সাধে! মাল আছে ··· কলকেতার বাবু।

ভরত একমনে জাল বুনছিল—কয়েক মুহূর্তের জন্যে শ্রীনাথের মুখের দিকে তাকালো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তারপর ব'ললো, চল্।

শ্রীনাথের পেছনে পেছনে ভরত স্টিমার ঘাটের দিকে এগোল।

দূর নদী-পথের দিকে প্রমীলা মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টি মেলে বেডিংয়ের ওপর বসে আছে। পরণের টক্‌টকে লাল শাড়ীখানিতে ভারী চমৎকার মানিয়েছে তাকে। হাল্‌কা হাওয়ায় মুখের ওপরে চূর্ণ চুলের গোছা কয়েকটি উড়ে উড়ে পড়ছে এসে। ভরত মুগ্ধ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাকিয়ে রইলো তার দিকে আর ফিরে ফিরে দেখতে লাগলো সুরেনকে: তার ফিট্‌ফাট বেশবাস—জুতো, জামা, মোজা। তারপর শ্রীনাথের ঠ্যালা খেয়ে সচেতন হ'য়ে উঠলো।

—শ্রীনাথ ব'ললো, নে—তুই ওই বড় তোরঙ্‌টা নে।

ভরত ব'ললো, তুই নিয়ে যা দাদা—আমার গা-টা তখন থেকে কেমন বমি-বমি ক'রছে।

এই এত মাল, আমি একা নিয়ে যাবো!

উঁহুঁ—আমি পারবো না। আমি যাই—গা-টা বড্ড বমি বমি ক'রছে।

আর কোন কথা না ব'লে হন্ হন্ ক'রে নৌকোর দিকে চলে গেল ভরত। শ্রীনাথ ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইলো।

ভরত ফিরে এল নৌকোয়। ছোট একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে মাঝি-জীবনের সমস্ত ঘর-সংসার। তারই মধ্যে হাফ-হাতা ফতুয়া একটা তালগোল পাকিয়ে গোঁজা ছিল—সেইটে টেনে বার ক'রলো ভরত, ঝেড়েঝুড়ে গায়ে দিল। ছোট্ট একটি জাপানী আয়না বের ক'রে খুব গম্ভীর হ'য়ে দেখলো একবার নিজেকে, অবিন্যস্ত এলো-মেলো চুলগুলিকে আঁচড়ে ঠিক ক'রে নিল। তার পর একটি বিড়ি ধরিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলো নৌকোয়।

একে একে সব জিনিস-পত্র বয়ে আনলো শ্রীনাথ এবং স্থরেনের সঙ্গে যে বছর আঠার বয়সের চাকরটি এসেছে।

শ্রীনাথ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ব'ললো, কতখানি বমি ক'রলি ?

সে অনেকখানি। চিঁ চিঁ ক'রে ব'ললো ভরত, গাটা ঝিম্-ঝিম্ ক'রছে তখন থেকে।

স্থরেনের পেছনে পেছনে প্রমীলা নৌকোর ধারে এসে দাঁড়ালো। স্থরেন লাফ দিয়ে উঠলো নৌকোয়—নৌকোর মুখ জলের দিকে সরে গেল। প্রমীলা দাঁড়িয়ে রইলো ডাঙায়।

স্থরেন ব'ললো, উঠে এস না—জুতো খুলে ফেল।

প্রমীলা জুতো খুললো বিব্রত হ'য়ে। তারপর শাড়ী হাঁটুর ওপর একটু তুলে হাসতে হাসতে জলে নামলো। নিটোল দু-খানি পা, হাঁটু আর উরু, শ্বেতাভ তামাটে চামড়ার ওপরে স্বপ্ন যেন থম্‌কে আছে, মনে হ'ল ভরতের। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে রইলো সেইদিকে।

শ্রীনাথ ভরতের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে ঘুরে দেখলো—ব্যস্ত হ'য়ে ব'ললো, আহা-হা জলে নামলেন কেন আবার ! ভরত, দে না লগিটা ঠেলে একটু।

ভরত অলস কণ্ঠে ব'ললো, থা-ক—উঠে পড়বে।

…সুন্দর নিটোল দু-খানি পা।…

সুরেনের হাত ধরে' নৌকোয় উঠলো প্রমীলা।

শ্রীনাথ ব'ললো, আপনাদের খাওয়ার কি হবে বাবু—রান্না ক'রবেন নাকি?

সুরেন প্রমীলার মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ললো, সে আবার অনেক হ্যাঙ্গাম!

প্রমীলা ব'ললো, খাবে কি তা হ'লে? হ্যাঁ—হ্যাঁ আমরা রান্না ক'রবো মাঝি। রান্নায় তোমার আপত্তি কেন? সুরেনের দিকে ফিরে বলে প্রমীলা, এক্ষুনি যে ব'লছিলে—নৌকোয় রেঁধে খেতে খুব ভাল লাগে তোমার?

ভাল তো লাগে—কিন্তু কষ্ট হবে তোমার।

আহা—

প্রমীলা দাঁতে দাঁত চেপে সুরেনের দুটো গাল দু-আঙুল দিয়ে টিপে ধরে' নাড়া দিয়ে দিল। হাসে সুরেন। ভরত তাকিয়ে আছে স্তিমিত চোখে: সে চোখ নির্নিমেষ, সে চোখে পলক নেই।

ওসব কেয়ার করে না প্রমীলা। বলে, আমাকে নিয়ে আসছিলে না তুমি—কত ধাপ্পাই দিচ্ছিলে, ভয় দেখাচ্ছিলে। কিন্তু এত ভাল লাগছে আমার।

ভরতেরও ভাল লাগছে—ভয়ানক ভাল লাগছে তার। এত সুন্দর মেয়ে সে দেখে নি জীবনে। কতকগুলো একঘেয়ে নিরবচ্ছিন্ন দিনের মধ্যে হঠাৎ একটি স্বপ্নের দিন উড়ে এসেছে যেন আজ। এত হাল্কা, এত পল্কা আর সুন্দর—একটু ছুঁলেই যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে।

শ্রীনাথ ভরতকে ব'ললো, গুণ টানতে পারবি?

ভরত চিঁ চিঁ ক'রে বলে, আমার শরীর খারাপ—কি ক'রে পারবো।

নিতাই কোথায় গেল?

কি জানি। এক্ষুনি আসবে ব'লে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে নিতাই এল। সে আর শ্রীনাথ গুণ টানতে চলে গেল। ভরত বসলো হাল ধরে'। সুরেন, প্রমীলা আর পঞ্চু রান্নার তোড়জোড় ক'রতে লাগলো। সবই ঠিক হ'ল, কিন্তু উনুন ধরানোটাই হ'ল একটা বিশ্রী বিভ্রাটের ব্যাপার। ফুঁ দিয়ে দিয়ে প্রমীলা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

প্রমীলার মুখ-চোখ লাল টুক্-টুক করছে তার লাল শাড়ীর মত—আর মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে ভরত।

প্রমীলা ব'ললো, অত বড় বড় চেলা কাঠ—তাই ধরছে না।

প্রমীলা কাটারি দিয়ে চেলা কাঠগুলো সরু ক'রবার জন্যে লেগে যায়। হাত লাল হয়ে গেল, চিবুকের কাছে ঘামের বিন্দুগুলি টপ্‌টপ্ ক'রে ঝরে পড়লো ফোঁটা ফোঁটা। কাটারিতে ধার নেই—সরু চেলা হ'ল না একটাও।

বিব্রত হয়ে তাকায় ভরতের দিকে প্রমীলা—হেসে ব'ললো, এটা দিয়ে তোমরা কি ক'রে কাঠ চের মাঝি!

ভরত তৎপর হ'য়ে বলে, আমি দিচ্ছি—

কিন্তু সুরেন তখন কাঠ চেলা করতে লেগে গিয়েছে। সরু সরু কাঠের চেলাগুলো ভরতের পায়ের কাছে জড়ো হ'তে লাগলো। ভরতের ইচ্ছে হ'ল, কাটারিটা কেড়ে নেয় সে সুরেনের হাত থেকে। ইচ্ছে হ'ল—ঠেলে ফেলে দেয় ক্যানেলের জলে সুরেনকে। আস্তে আস্তে আবার সে ফিরে গিয়ে হাল ধরে বসলো।

উনুন ধ'রলো শেষ পর্যন্ত। রান্না বসলো। সুরেন মাঝে মাঝে প্রমীলাকে সাহায্য ক'রতে এসে জিনিস-পত্র সব ছড়িয়ে একাকার ক'রে ফেলে।

প্রমীলা চেলা কাঠ উঁচিয়ে বলে, পালাও ব'লছি। বিরক্ত ক'রো না।

…এ আর একটা জীবন। ভালো লাগে।…

প্রমীলার হাল্‌কা হাসি, রাগ আর দীর্ঘ চোখের কটাক্ষ, নিটোল নগ্ন বাহু আর সুন্দর নখগুলি। ভরত শুধু দেখতে লাগ্‌লো, অফুরন্ত দেখা।

বেলা পড়ে এল এক সময়ে।

শ্রীনাথ আর নিতাই তামাক খেতে উঠলো নৌকোয়। তামাক সেজে নিয়ে ভরতকে ডেকে চলে' গেল ক্যানেলের ওপরে।

ভরতের দিকে তাকিয়ে শ্রীনাথ বলে, গোটা দুপুরটা টানলুম—আর পারছি নে, তুই এবার টান একটু। তারপর ফের না হয় আমি—কি বলিস্?

অনিচ্ছায় ভরত বলে, আচ্ছা।

শ্রীনাথের চুলে পাক ধরেছে। তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে বলে, এই বয়সে কি আর গুণ টানা পোযায়! কোমর ধরে যায়।

ভরত নিঃশব্দে নৌকার দিকে তাকিয়ে আছে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে প্রমীলাকে।

নিতাই বলে, রাত্রে নৌকো রাখবি কোথায়?

বনগাঁর কাছাকাছি। নইলে সুবিধে হবে না। ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে শ্রীনাথ, কি বলিস্ রে? ব'লে সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ভরতের দিকে তাকালো।

ভরত কোন উত্তর দিল না।

ওদের তামাক খাওয়া শেষ হ'ল। শ্রীনাথ ফিরে গেল নৌকোয়। নিতাই আর ভরত ঝুঁকে ঝুঁকে গুণ টানতে লাগলো।

মাইল খানেক এসেই ভরত বলে, থাম নিতাই—তামাক খাই চল্।

এক্ষুনিতো খেলি।

উঁহুঁ, থাম্।

নিতাই দড়ি গুটোতে লাগলো। ভরত নেমে গেল ক্যানেলের নিচে—নৌকোর কাছে। গাড়ু থেকে তামাক বের ক'রতে লাগলো সে কিছুক্ষণ ধরে', তারপর হুঁকো, তারপর তামাক। হাত যেন চলে না ভরতের। শ্রীনাথ চটে বলে, কি কচ্ছিস এতক্ষণ ধরে'! নে চট্‌পট্।

যাচ্ছি,চেঁচাস্ নি।

কল্কেয় ফুঁ দিতে দিতে দেখতে লাগলো সে প্রমীলাকে। প্রমীলা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌ছে।

তারপর আবার কিছু দূর টেনে চললো ভরত। কিছুদূর গিয়ে আবার বলে, তামাক খাবো।

নিতাই বিরক্ত হ'য়ে বলে, কি হ'ল তোর আজ! অত তামাক তো খতিস্ না কোনদিন। চল্ চল্—ওই তালগাছটার কাছে গিয়ে খাবো।

ভরত গুণ টানতে লাগলো। পেছনে ঘুরে দেখলো একবার—প্রমীলাকে দেখা গেল না।

তালগাছের কাছে এক সময়ে নৌকো এল। ভরত ব'ললো, থাম্ এইবার ভাই নিতাই।

নিতাই বসে' পড়ে' বলে, যা—নিয়ে আয় সেজে। ইস্—তুই যে একেবারে ভিজে গেছিস্ রে! ফতুয়াটা খুলে ফেল্ না। ফেঁসে যাবে যে কাঁধের কাছে।

ফাঁসবে কেন—নতুন জামা। আঠারো আনা নিয়েছিল—জানিস্? বাজে জিনিস নয়।

কিন্তু গরম লাগছে না তোর?

গরম লাগবে কেন! ওই যে বাবুরা অত জামা কাপড় পরে আছে, গরম লাগছে নাকি ওদের!

আচ্ছা যা যা, তামাক খাবি তো খেয়ে নে। সেজে নিয়ে আয় চট্‌পট্।

ভরত হঠাৎ দ্বিধাকাতর কণ্ঠে বলে, তুই যা না ভাই।

ব'সে পড়েছি, যা-না বাপু তুই। শ্রীনাথ কি রকম কট্‌মট্ ক'রে তাকাচ্ছে দ্যাখ। যা চট্‌পট।

ভরত বলে, আমার টেরিটা ঠিক আছে কিনা, দ্যাখ দিকিন একবার।

নিতাই হেসে বলে, তুই যে হঠাৎ ভদ্দর লোক হ'য়ে উঠলি রে—হ'লো কি তোর!…

ভরত মাথার টেরি-কাটা লম্বা লম্বা চুলে সন্তর্পণে হাত বুলাতে বুলাতে

চলে গেল। নৌকোর কাছাকাছি আসতে চোখাচোখি হয় প্রমীলার সঙ্গে, আরও বেশী ক'রে ঘেমে ওঠে ভরত।

তামাক খেয়ে তারা আবার গুণ টেনে চললো। সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। চাঁদের আলো ঝিক্ মিক্ করছে কেনেলের জলে। ভরত পেছন ফিরে দেখে বার বার। প্রমীলাকে স্পষ্ট দেখা যায় না—শুধু যেন একটা অস্পষ্ট ছায়া-মূর্তি বসে আছে জানালার ধারে। কিন্তু সেই দুর্নিরীক্ষ্য অস্পষ্টতায়ও যেন সমস্ত দেখতে পায় ভরত—সেই দীর্ঘ প্রশান্ত চোখ, লম্বা সরু আঙ্গুলগুলি আর সুন্দর হাসি।

ভরত গুণ টানতে টানতে কপালের ঘাম মুছে বলে, বেশ সুন্দর মেয়েটি —না রে ?

নিতাই ভরতের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, হ্যাঁ, বেশ সুন্দর।

…এত দেখতে ইচ্ছে করে মেয়েটাকে ! মুখোমুখি দু-চোখ ভরে শুধু দেখা।…

কিছুক্ষণ পরে ভরত ফের যখন গুণ গুটিয়ে তামাক খেতে এল—তখন শ্রীনাথ আর রাগ চেপে রাখতে পারে না। হাল ছেড়ে দিয়ে নৌকো থেকে ডাঙায় লাফিয়ে পড়ে বলে, তুই বসে বসে তামাক খা, পাঁচ-শো বার আসতে হবে না।

শ্রীনাথ চটে' গুণ টানতে চলে গেল। ভরত নীরবে একটি বিড়ি ধরিয়ে হাল ধরে বসলো।

ভারি সুন্দর জ্যোৎস্না-ধোয়া ফুট্‌ফুটে রাত্রি। প্রমীলা আর সুরেন বাইরে বেরিয়ে এসে বসেছে। দু-পাশে ক্যানেলের উঁচু পাড়ের ওপরে ছোট ছোট বাবলা গাছে অন্ধকার কালো হয়ে লেগে আছে, জলের একেবারে কিনারে লম্বা লম্বা জলো ঘাস আর কাঁটা গাছ। ক্যানেলের স্থির শান্ত জলে জ্যোৎস্না ভাঙা কাঁচের মত ছড়িয়ে পড়েছে লাখো টুকরোয়।

ভরত একধারে চুপ করে বসে আছে—পঞ্চু ধরে' আছে হাল।

সুরেন বলে, পঞ্চু হাল ধরতে পারিস ?

শিখে ফেলেছি বাবু।

সুর দেখি—আমি একটু ধরি। সুরেন উঠলো।

প্রমীলা ব'ললো, তুমি হাল ধরতে পার ?

কেন পারবো না।

সুরেন হাল ধরে বসলো। কিছুক্ষণ পরেই নৌকোর মাথা বেঁকে তীরমুখো হ'ল, নৌকা ভিড়লো জলের ধারের কাঁটা জঙ্গলের মধ্যে সর সর ক'রে।

প্রমীলা হেসে বলে, বাঃ বেশ হাল ধরতে পার তো !

সুরেন হাল ছেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে প্রমীলার পাশে এসে বসলো।

অনেকক্ষণ বসে রইলো তারা চুপচাপ দূরের দিকে তাকিয়ে। প্রমীলার একটি হাত সুরেনের হাতের মধ্যে।

সুরেন ব'ললো, একটা গান গাইবে—রবি ঠাকুরের গান, আস্তে আস্তে গুণ্ গুণ্ ক'রে ?

প্রমীলা গুন্ গুন্ করে গান ধরলো।

ভরত মুগ্ধ হয়ে শোনে।

গান শেষ হ'য়ে গেল। সুন্দর সকরুণ সুর একটি ভরতের কানে কানে তখনও ঘুরতে লাগলো। অজানা সুন্দর একটি সুর।

হঠাৎ ভরত সুরেনকে জিজ্ঞেস করে, আপনারা আবার কবে ফিরবেন বাবু ?

সুরেন ব'ললো, এই মাসখানেক পরে।

এই দিক্ দিয়েই ফিরবেন তো ?

নাঃ, এদিকে বড্ড হাঙ্গামা মাঝি।

কেমন যেন হতাশ হয় ভরত। ম্রিয়মান কণ্ঠে তবু বলে, এদিক্ দিয়ে ফিরলে আমার নামে একটু চিঠি লিখে কারুকে গাঙচরের হাটে পাঠিয়ে দেবেন বাবু, ঠিক সময়ে নৌকো নিয়ে হাজির থাকবো।

সুরেন হেসে বলে, আচ্ছা—সে পরের কথা পরে হবে।

...কি জানি, প্রমীলা আর এ পথে ফিরবে কি না !...

বুকের মধ্যে কেমন শির্ শির্ করে ভরতের।

চাঁদ ঢলে' পড়েছে মাথার ওপর থেকে পশ্চিম দিকে। রাত প্রায় একটা হবে। বনগাঁয়ের মাঝামাঝি এসে নৌকো থামলো। শ্রীনাথ গুণের দড়ি গুটিয়ে নৌকোয় রাখলো, নোঙর ফেললো। ভরতকে ডেকে ব'ললো, এই—তামাক সেজে নিয়ে আয়।

ক্যানেল পাড়ের ওপরে উঠে গেল শ্রীনাথ।

সুরেন, প্রমীলা, পঞ্চু সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোট্ট জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে প্রমীলার মুখে, কতকগুলি চুল এসে পড়েছে গালের ওপরে। ভরত কল্কেয় আগুন তুলতে তুলতে চোখ তুলে তুলে দেখলো কয়েক বার। তারপর নৌকো থেকে নেমে ওপরে উঠে গেল।

শ্রীনাথ চাপা গলায় বলে, সব তো ঘুমোচ্ছে—না?

ভরত শুধু ব'ললো, হুঁ।

নিতাই হেসে ব'ললো, আর জেগে থাকলেই বা কি!

হ্যাঃ! শ্রীনাথ ব'ললো, তা' হ'লে চল্—উমেশ ওদের খবর দিয়ে আসি। ওরা জন দুয়েক এলেই হবে। ওই বাবুটাকে এক ঘা দিলেই তো ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে। মেয়েটা বড় জোর একটু চেঁচাবে। কিন্তু কে-ই বা শুনতে পাচ্ছে! কি বল্? এক ক্রোশের মধ্যে কোথাও কিচ্ছু নেই। ব'লে হাসে শ্রীনাথ।

নিতাই ব'ললো, কানে ওগুলো কিসের দুল বল্ দিকিন? বেশ ঝক্-ঝক্ করে।

দামিক পাথর-টাথর হবে নিশ্চয়ই। শ্রীনাথ ব'ললো, হাতে চার গাছা ক'রে সোনার চুড়ি আট গাছা, তারপর গলার হারটা সব শুদ্ধ ভরি বারো সোনা হবে। শ্রীনাথ হেসে উঠলো—খুশিতে বীভৎস হ'য়ে উঠলো তার মুখ। মুখ নেড়ে নেড়ে বলে, এই যুদ্ধের বাজারে কত দাম হবে বল্ দিকিন—হিসেব কর।

নিতাই তাড়া দিয়ে ব'ললো, চল্ তাহ'লে ওদের খবর দিয়ে আসি।

নিস্পৃহ কণ্ঠে ভরত বলে, আমি যাব না আর—তোরা যা দুজনে।

তারপর শ্রীনাথ আর নিতাই মাঠের মধ্যে গিয়ে নামলো টলতে টলতে, মিশে গেল দূরের অস্পষ্টতায়।

ভরত ফিরে তাকালো নৌকোর দিকে। প্রমীলা ঘুমোচ্ছে, অনাবৃত কণ্ঠদেশে সরু হারটি ঝিক্‌মিক্ ক'রছে. গালের কাছে ইয়ারিংয়ের পাথরটা জ্বল্ জ্বল্ করছে জ্যোৎস্নার আলোয়। ঘুমের ঘোরে হাত নাড়ল বুঝি প্রমীলা, চুড়ি-গুলি বেজে উঠলো, ভারি মিষ্টি আওয়াজ! কান পেতে শোনে ভরত, আবার শুনতে ইচ্ছে হয় তার।

…সোনার আওয়াজ এত সুন্দর!…

ভরত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো প্রমীলার জ্যোৎস্না-পড়া মুখের দিকে: অকাতরে ঘুমোচ্ছে প্রমীলা, ভারি অসহায় আর সুন্দর। সুরেন মুখ ঘুরিয়ে ঘুমোচ্ছে—নাক ডাকছে তার!

জানালা দিয়ে হাত বাড়ালো ভরত। ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে সে। প্রমীলার এলোমেলো চুলগুলি স্পর্শ করলো সে কম্পিত হাতে, মুখের ওপরে এসে পড়া চুলগুলি সরিয়ে দেওয়ার লোভ সে ছাড়তে পারলো না। হঠাৎ প্রমীলার নাকে লেগে গেল তার কম্পিত হাতের আঙুল একটা। ঘুমের ঘোরে সেই হাত বুকের কাছে জড়িয়ে ধরলো প্রমীলা। হাত ধরা রইলো প্রমীলার দুটি ঘুমন্ত হাতের মধ্যে। থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলো সে।

…আর একটা জগত, আর একটা জীবনের স্বপ্ন কাঁপে চোখে।…

ভরত আস্তে আস্তে প্রমীলার অবসন্ন হাতের মুঠি থেকে টেনে নিল নিজের হাত। ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপে সে। তারপর পঞ্চুকে ঠ্যালা দিয়ে ডেকে তুললো। চোখ ঘষতে ঘষতে উঠে বসলো পঞ্চু।

তখনও কাঁপছে ভরত। কম্পিত কণ্ঠে ব'ললো, হাল ধরতে পারবি?

হুঁ।

ওঠ তবে।...

গুণ টানতে উঠে ক্যানেল পাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে দূরন্ত মাঠের দিকে সভয়ে একবার তাকালো ভরত। দিকদিগন্ত ভেসে গিয়েছে জ্যোৎস্নায়। হঠাৎ তার ভয়ানক ভালো লাগে আর কেমন যেন তার ভয় করে। হঠাৎ ভয় করে তার দীর্ঘ চব্বিশ বছর পরে। তারপর ঝুঁকে ঝুঁকে গুণ টানে ভরত এক মাইল, দু-মাইল, তিন মাইল। লক-গেটের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে যেন সে। সেখানে লোকালয় আছে, জল-পুলিশ আছে।

১৩৪৮

জননীর জন্ম

গ্রামে ফিরে এলো রাধা—একা। এবং তারপর চৌধুরী বাড়িতে তার স্থানও হলো।

কিন্তু অতীতের জের তবু যেন শেষ হয় না। গরীব চাষীর বৌ সে। স্বামীর মৃত্যুর পর সেই কবে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় স্বামীরই জ্ঞাতি-ভাই বিপত্নীক নিবারণের আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর অসংখ্য অন্ধকার দিন। তার ঘোর যেন কাটতে চায় না জীবন থেকে।

কোথায় গেল রাধার সেই মেয়েটা—যার চেহারাটা হুবহু নিবারণের মতো? কোথায় রেখে এলো তাকে রাধা?

গ্রামের মন্থর জীবনযাত্রার ধারায় হঠাৎ একটা চাঞ্চল্য আসে অসংখ্য জিজ্ঞাসায়।

সন্ধ্যের পর অটলের মুদি দোকানে বেচা-কেনা হয় না। তবু এসে ভিড় করে গ্রামের চাষী-মজুরগুলি। গ্রাম-গ্রামান্তরের অনেক কথা হয়: রাধার কথা ওঠে—তার মেয়েটার কথা ওঠে।

অটল অল্পতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে, সব বাজে কথা—বানানো

কথা রাধার। এতদিন কেউ কোথাও ছিল না—আজ দরকার পড়তেই কোথায় সেই সুন্দরবন, সেখান থেকে মেয়ের মামা এসে হাজির। এলো আর নিয়ে চলে গেল মেয়েটাকে! অমনি বললেই হ'লো!

কথাগুলোর ধরন ভালো লাগে না শিবনাথের; জোর গলায় প্রতিবাদ করবারও ক্ষমতা নেই তার। এক কোণে চুপ করে বসে থাকে সে আর মনে মনে যুক্তি সঞ্চয় করেঃ তবে কি করবে রাধা? বাসব চৌধুরীর স্ত্রী বিছানা নিয়েছে ছেলে হওয়ার পর। তার পরিচর্যার জন্যে শুধু একা রাধার স্থান হতে পারে—কিন্তু গ্রামের ইতিহাস-বিজড়িত তার মেয়েটার হবে না। মেয়েটিকে তবে কোথায় রাখবে রাধা?

গ্রামের চৌকিদার গোপাল—অনেক খোঁজ খবর রাখার গাম্ভীর্যে স্থির আর নিঃশব্দ। অটল বলে তাকে, একটু ভালো ক'রে খোঁজ নে দিকিন গোপাল। কে জানে কোথাও নিয়ে গিয়ে হয়তো দিয়েছে শেষ ক'রে। সেবার সেই যে একটা হ'লো? সেই রকম হয়তো।...

হঠাৎ কেমন যেন ভয় করে শিবনাথেরঃ অটলের কথাই যদি সত্যি হয়! আর সরকারী চাকরী করে ওই গোপাল, কতো কিই তো করতে পারে! ভয়ানক মন খারাপ হ'য়ে যায় তার, বসতে আর ভালো লাগে না ওদের মধ্যে। নিঃশব্দে সে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লো পথে। অন্য মনে চলতে চলতে ভাবেঃ এদের সব কথা রাধাকে জানাবে সে, সতর্ক করে দেবে। তারপর ঔদাসীন্যে ভ'রে যায় তার মন। গরীব চাষী আর একেবারে সহায় সম্বলহীন সে। রাধা আমল দেয় না তাকে। হোক—তবু রাধাকে সব ব'লবে সেঃ যদি বিপদে পড়ে রাধা!

কিন্তু বিপদে পড়লো শিবনাথ নিজে। রাধা কটুকণ্ঠে গালাগালি দিয়ে শাসিয়ে গেল, এর ব্যবস্থা ক'রবে সে।

তারপর বাসব চৌধুরীর অকরুণ শাসন। চৌধুরী বাড়ির আশ্রিত অনাথা একটি বিধবার কাছে কুপ্রস্তাব ক'রতে সাহস পায় শিবনাথ!

সন্ধ্যের পর আবার উত্তেজনার সৃষ্টি হয় অটলের দোকানে। সবাই আসে, শুধু শিবনাথ আসে না।

সত্যিই কিছু ব'লেছিল নাকি শিবনাথ? গোপালকে জিজ্ঞেস করে অটল, ভেতরের খপরটা ভালো ক'রে খোঁজ কর দিকিন গোপাল!

ক'রেছি। শিবনাথ খারাপ কথা কিছু বলে নি। বুঝলি না, এখন চৌধুরীবাবু স্বয়ং।···

হাসলো গোপাল। তারপর ব'ললো, উঃ, সে কি মার! গোপালের চোখ-মুখ কুঁচকে যায় প্রহারের তীব্রতার অভিব্যক্তিতে।

এই, সব সাবধান।···

অটল ভঙ্গী ক'রে বলে আর সবাই হাসে। তাদের তরল হাসির হররা বাইরের গভীর অন্ধকারে আর হাওয়ায় হঠাৎ একটা তরঙ্গ তুলে হুহু করে এগিয়ে গেল দূর মাঠের দিকে। একটা শেয়াল থম্‌কে দাঁড়ালো মাঠের মাঝখানে, নিঃশব্দে গ্রামের দিকে তাকালো একবার। তারপর আবার আস্তে আস্তে মিশে গেল মাঠের সীমান্তের অন্ধকারে।

নতুন ধারায় আলোচনা হয় ওদের: উদ্দাম স্খলিত জীবন আর আদিম উত্তাপ। তার মাঝখানে রাধার সেই অপ্রত্যাশিত মেয়েটি নিঃশেষে হারিয়ে গেল একদিন, শিবনাথও।

গ্রামে ভালো লাগে না আর শিবনাথের। বর্ষার জন্যে উৎসুক হ'য়েছিল সে। বর্ষা নামলো—সেও চলে গেল গ্রাম ছেড়ে নতুন এক আবাদি চরে। যাওয়ার সময় দেখা ক'রে গেল সে রাধার সঙ্গে। অনেক কথা ব'লবে ভেবেছিল কিন্তু বলা হ'ল না সব। রাধা উদ্যত চাবুকের মতো হেসে উঠলো তার মুখের ওপর।

শিবনাথ শুধু ব'ললো, গরীব ব'লে আমারে ঘেন্না কর রাধা। তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'ললো, কিন্তু আমি তোকে ভালোবাসতাম।

সে তো গ্রামের সবাই ভালোবাসে রাধাকে। রাধা জানে। হি হি ক'রে হাসলো রাধা।

ব'ললো, গরীবের আবার অতো সখ কেন! ছোটবাবুকে ব'লবো আবার?

শিবনাথ সভয়ে তাকালো চারদিকে—তারপর মুখ শুকনো ক'রে চলে গেল হন্ হন্ ক'রে।

আবার সেই গ্রাম্য জীবনের নিরবচ্ছিন্ন মন্থর দিনের পর দিন—পুরাতন আর দুঃসহ। সন্ধ্যের পর অটলের দোকানে তেমনি ভিড় জমে। আগামী বর্ষা আর চাষের কথার মাঝখানে সবাই ডুবে যায় ওরা।

বর্ষা এসে পড়লো, দোকানের মাল-পত্রগুলো আনা হ'ল না। শিবনাথ··· হঠাৎ ভুল করে অটল—হঠাৎ মনে পড়ে, শিবনাথ নেই।

হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে অটলের:

লোকটা বড়ো ভালো ছিল হে। এই মালপত্র আনার ব্যাপারে যখন যেখানে যেতে ব'লেছি তখনি গিয়েছে। বুদ্ধিটা একটু মোটা ছিল বটে, কিন্তু স্বভাবটি বড়ো ভালো ছিল, ভারি অনুগত। ওই রাধাই তাড়ালো তাকে।

তারপর বর্ষা আর জীবন যুদ্ধ। শিবনাথ হারিয়ে গেল। সন্ধ্যের পর অটলের দোকানে আর ভিড় জমে না। তার বন্ধ দোকানের সুমুখ দিয়ে গরু আর মানুষের পায়ের ছপ্ ছপ্ শব্দ বর্ষাভেজা অন্ধকারে আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে যায়—জল আর মাটির সঙ্গে সংগ্রামরত ওদের দুটি মাস।

আবার একদিন হেমন্তের অলস সন্ধ্যায় অটলের দোকানের ম্লান আলোয় উত্তেজনায় লোকগুলি ভিড় ক'রে এল: রাধা আর এ গ্রামে নেই। কোথায় গেল কে জানে!

গোপাল, ব্যাপারটা তো বুঝতে পারছি না! সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে অটল, হঠাৎ চলে গেল কেন!

পালিয়েছে।

শুধু শুধু পালালো!

নষ্ট মেয়েমানুষ—তার আবার—হ্যাঃ।

রহস্যের সব গভীরত্বটা ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চায় গোপাল।

না হে না, চোধুরী বাড়ির তোয়াজ ছেড়ে শুধু শুধু পালাবার মেয়ে রাধা নয়।

তারপর হঠাৎ যেন আলো এসে পড়ে অটলের মুখে। বলে, আচ্ছা, খোঁজ নে দিকিন—বেদিনী বুড়ীর কাছে গিয়েছিল কিনা! বিপদে-আঁপদে ছিল তো ওই বেদিনী বুড়ী—বুঝলি না, শেকড় বড়ি-টড়ি অনেক রকম জানে বুড়ী। নিবারণ তবু মেয়ের মুখ দেখেছিল—হয়তো বাসব চৌধুরীর কপালে তা-ও জুটলো না।

অতুল বলে, খোঁজ নিয়েছিলাম—রাধা যায় নি সেখানে।

সে তোকে জানিয়ে যাবে কি না! অটল খেঁকিয়ে উঠলো।

সকলে হাসে—সকলরবে হাসে।

আর রাধার কান্না পায়—অনেক দূরে গিয়ে রাধার কান্না পায়। নিরুদ্দেশ ভবিষ্যতে যতো দূর দৃষ্টি যায়—আবার সেই পুরাতন ভারবাহী ক্লিষ্ট দিন। কিছু টাকা দিয়েছে বাসব চৌধুরী—আর বেশ ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে বন্দুকের দিকে মোটা মোটা আঙুল তুলে: অনেক দূরে চলে যাক্ রাধা—তার দূরবিসারী সম্ভ্রমসীমানার বাইরে—অনেক দূরে কোথাও!

রুদ্ধশ্বাসে পালিয়ে এসেছে রাধা। মৃত্যুকে ভয় করে সে। সে বাঁচতে চায়। কিন্তু কোথায় যে যাবে সে—ভেবে পায় না। শিবনাথের কথা মনে পড়ে। গ্রামছাড়া উদ্‌ভ্রান্ত আকাশের মতো একটা নিরুদ্দেশ পৃথিবী আছে—আর সেখানে শুধু মনে পড়ে শিবনাথকে। এ ছাড়া কারুকে আর মনে পড়ে না?

নদীচরের পথ কোন দিকে গো?

সোজা সাগর কোণের দিকে।

জিজ্ঞেস করে আর হাঁটে রাধা। ভিন্ গ্রামের চাষীরা সকৌতূহলে তাকায় একটা রোদে পোড়া কান্নামলিন মুখের দিকে।

কোনো রকমে মাথা গুঁজে থাকবার মত ঘরটুকু, তার কোলেই ধানবন। দরজার সুমুখে বসে বসে অসংখ্য কল্পনার হাওয়ায় দোল খায় শিবনাথ কচি ধানগাছগুলির মত। আশৈশব সে পরের বাড়িতে খেটে খেটে মানুষ। দীর্ঘ দিন পরে আজ নিজের ছোট্ট অধিকারবোধটুকু, প্রতিষ্ঠাটুকুর আনন্দ নিরুদ্দেশ অনাগতের মাঝখানে আত্মহারা করে দেয় তাকে। রাধার কথা মনে পড়ে—তাকে অনুভব করে সে সঙ্গীহীন জীবনে।

তারপর হঠাৎ একদিন চমকে উঠলো শিবনাথ : রাধা।

হঠাৎ এখানে কেন রাধা—কোথায় যাবে সে ?

এই খানেই তো এলো সে। আসার সময় কি বলে এসেছিল শিবনাথ—ভালোবাসার কথা না ?

ক্ষণচঞ্চল একটি আনন্দের আবেগে হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ার মতো যেন হু হু করে রাধার ওপর দিয়ে বয়ে চলে গেল শিবনাথ। ঝড় আর অরণ্যের আর্তনাদ।

ভালোবাসে বৈকি শিবনাথ—রাধাকে ভালোবাসে সে। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন রাধা—ঘরের ভিতরে আসুক।

আত্মীয়বন্ধুহীন একা মানুষ শিবনাথ—রাধাকে নিয়ে নূতন ক'রে ঘর পাতবে সে, আগামী বছর বেশী করে চাষ ক'রবে আর একখানা ঘর তুলবে। ঘরের পেছনেই ছোট্ট ডোবা খুঁড়বে একটা—রাধার স্নাতে কোনো অসুবিধে না হয়। সব একা করবে সে—আর রাধাকে ভালোবাসবে। পেশীতে উল্লাস শিবনাথের। রাধা ছেড়ে যাবে না তো তাকে ?

রাধা নিরুত্তর। শুধু নিঃশব্দে হাসে—পুরাতন আর অভ্যস্ত হাসি। শিবনাথের মন ভরে না।

সকালে রোজ যেমন ঘুম থেকে ওঠে—তার অনেক আগে উঠলো শিবনাথ। দেখলো রাধা ঘরে নেই।

কোথায় গেল রাধা! চলে গেল নাকি? হঠাৎ বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠলো! বাইরে বেরিয়ে এলো সে।

ওই তো রাধা।

রাধা বমি ক'রছে।

ব্যস্ত হয়ে পড়লো শিবনাথ। রাধার অসুখ ক'রেছে নাকি?

হ্যাঁ, এই জন্যেইতো চৌধুরীরা রাখলো না।

তাইতো!

এ অবস্থায় কি করা উচিৎ—ভেবে পায় না শিবনাথ।

শিবনাথ শুধু ব'ললো, শুয়ে পড় গিয়ে রাধা।

কোনো কাজ করতে হবে না রাধাকে—সব ক'রবে শিবনাথ। ভালো হয়ে উঠুক আগে রাধা।

ঘরের সুমুখে কিছুটা জায়গা জুড়ে রবিখন্দের ক্ষেত শিবনাথের। মাঠে চাষের কাজ ফুরিয়ে গিয়েছে। এখন ঘরের সুমুখের ওই জায়গাটুকুতে ব্যস্ত থাকে শিবনাথ। রাধা দরজার সুমুখে বসে বসে দেখে: শিবনাথের কাজ, তার শ্রমিক দেহের পেশীগুলির নৃত্য—আর হঠাৎ একটি নতুন জীবনের। ভালো লাগে রাধার—শুধু দূর থেকে ভালো লাগা। কোথায় যেন নেশা লাগে। আর ভাবে, এই রকম একটি জীবনে তার কি কোনো ভাগ আছে? হয়তো শিবনাথও তাড়িয়ে দেবে দু-দিন পরে।

গরুতে বেড়াটা ভেঙে দিয়েছে এক জায়গায়। ভাঙা বেড়া জুড়তে গিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে শিবনাথ, একা পারছে না। একপাশ বাঁধতে গেলে আর একপাশ ঝুলে পড়ে।

রাধা নিঃশব্দে উঠে এল শিবনাথের পাশে—ব'ললো, আমি ধরছি—তুমি বাঁধো।

রাধার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো শিবনাথ—ব'ললো, তোকে ডাকে কে! চুপ ক'রে শুয়ে থাকগে যা। তোর অসুখ ক'রেছে না! কদিন বমি ক'রছিস্—

হঠাৎ রাধার মুখ শুকনো হয়ে যায়।

জোর ক'রে হেসে ব'ললো, এইটা বেঁধে নাও—যাচ্ছি।

না, যা তুই।

বেঁধে নাও না।

রাধা হাসে শিবনাথের দিকে চেয়ে।

কেমন যেন নতুন লাগে রাধার।

শিবনাথ যেন নতুন এক ধরনের পুরুষ। দিনের পর দিন ধরে তাকে যেন চিনতে হয় নতুন ক'রে। বুঝতে পারে না রাধা—কি চায় শিবনাথ। শুধু এইটুকু বোঝে, অনেক কি যেন চায় শিবনাথ। কাজ চায়, ঘর চায়, সংসার চায়, তাকে চায়। অনেক-কিছু চায়—যার হদিস রাধা নিজেও পায় না। সরল আর নির্বোধ লোকটা—তবু তাকে যেন বুঝতে কষ্ট হয় রাধার। আর ভালো লাগে তার: শিবনাথের অনেক কিছু চাওয়ার মাঝখানে নিজেকে যেন অনুভব করে সে। তারও কিছু যেন দেওয়ার আছে—যা সে জানতো না। নিশ্চিন্ত একটি নির্ভর, স্নেহ-সতর্ক একটি অন্তর, আর নির্বোধ শিবনাথ নতুন একটা জগতের পরিবেশ দিয়ে ঘিরে ফেলেছে তাকে। এখানে দম যেন বন্ধ হয়ে আসে রাধার। ভালো লাগে তার—ভালো লাগে না। নিজের ফাঁকিতে ছটফট করে সে। চারদিকে যেন তার প্রত্যক্ষ অপমান—তীব্র আর মর্মভেদী। ঘুমন্ত শিবনাথের বাহুবন্ধন, এই ছোট ঘরটুকু—এই এখানকার বিচ্ছিন্ন দিনের পর দিন শিথিল হয়ে পড়বে হয়তো একদিন।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় শিবনাথের। অন্ধকারে উঠে বসলো সে।

কি হলো রাধার—অমন ছটফট ক'রছে কেন সে!

দুর্নিবার আবেগে ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ে' নিজেকে চুরমার ক'রে দিতে ইচ্ছা হয় শিবনাথের ওপরে। মিশিয়ে দিতে ইচ্ছা হয় নিঃশেষে।

তবু সন্দেহ করে রাধা: সব পুরুষকেই তো চিনেছে সে। সব শিথিল হয়ে পড়বে একদিন। শিবনাথ তাড়িয়ে দেবে তাকে।

শিবনাথ সভয়ে বলে, কি হলো—খুব কি গা বমি বমি করছে?

শিবনাথের একটা হাত চেপে ধরলো রাধা—ব'ললো, বলো তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবে না কোনোদিন।

রাধাকে তাড়িয়ে দেবে কেন শিবনাথ? কি পাগল রাধা! হাসে শিবনাথ।

শিবনাথ তরল কণ্ঠে বলে, তুই-ই হয়তো তাড়িয়ে দিবি আমাকে কোনো দিন। যেমন দিয়েছিলি···

পুরাতন কথা এসে পড়ে।

সমস্ত অতীতকে মুছে দেওয়া যায় না—অতীতের সমস্ত জেরকে? মনে মনে জিজ্ঞেস করে রাধা। নতুন জীবন আর শিবনাথ।

আমাকে একটু ওষুধ এনে দেবে? সেই বেদিনী বুড়ীকে জানো তো। তার কাছে যাবে একবার?

বেশ তো, কালই যাবে।

খবরদার কিন্তু, গ্রামের কেউ যেন জানতে না পারে!

বাসব চৌধুরীর বন্দুকটা মনে পড়ে। আর পুরানো দিনগুলো কি রকম সব যেন কালো কালো লোহার চোঙের মত, কঠিন আর মারাত্মক।

বেশ তো, লুকিয়ে যাবো—লুকিয়ে চলে আসবো।

কিছুক্ষণ নীরবে কি যেন ভাবে রাধা। তারপর ব'ললো, এক কাজ কর। একেবারে বেদিনী বুড়ীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো। কিছু টাকা দিয়ো—তাহলেই আসবে। আমার কাছে টাকা আছে কিছু দেবো।

গোপন গচ্ছিত-টাকার কথা এতদিনে বলে রাধা।

পরদিন শিবনাথ বেদিনী বুড়ীকে আনতে চললো।

যাওয়ার সময় ব'লে গেল, দুপুর বেলা আজ দুটি বৌ আলাপ ক'রতে আসবে তোর সঙ্গে। একা থাকবি—তাই আসতে ব'লেছি তাদের।

হঠাৎ কেমন যেন ভয় করে রাধার। ব'ললো, কি বলেছ তাদের!

কি আর ব'লবো!' বলেছি, গাঁ থেকে আমার বৌ এসেছে।

শিবনাথ হাসলো। তারপর চলে গেল সে।

তারপর দিন দুপুর বেলা রাধার সঙ্গে আলাপ ক'রতে এল সেই দুটি বৌ, কিশোরী আর সরমা। একটি ছোট ছেলে সরমার কোলে।

মেয়ে দুটি তারই সমবয়সী, কুড়ির ভেতরে। দিব্যি হাসি-খুশি মুখ। সমাজ-সংসার, ছেলেমেয়ে নিয়ে এই দুটি মেয়ে যেন পরিপূর্ণ। ওদের ভয় করে রাধার, ভালো ক'রে কথা কইতে পারে না সে ওদের সঙ্গে। ভয়ানক অসহায় মনে হয় তার নিজেকে।

সরমা সবিস্ময়ে ব'ললো, ছেলেমেয়ে একটিও হয় নি! নষ্টও হয় নি একটিও?

রাধা নীরবে শুধু মাথা নেড়ে জানালো, না।

কোথাও ছুটে পালাতে ইচ্ছে হয় রাধার।

সরমা সহানুভূতি জানায়।

কিশোরীর ছেলেমেয়ে হয় নি—হাতে তার অনেকগুলি মাদুলি বাঁধা। কৃত্রিম ক্রোধে সরমাকে বলে, বড় দেমাক হয়েছে তোর—ভাঙবো এবার। তোর ছেলের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে আমার মেয়ে। তারপর ফিক্ ক'রে হেসে রাধার দিকে তাকিয়ে বলে, আমার মেয়ে হ'লে ওর বড় ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবো—ঠিক ক'রে রেখেছি। আর আমার যদি ছেলে হয়! তবে?

ওদের অন্তরঙ্গ কথার মাঝখানে রাধা শুধু যেন নীরব দর্শক—কান্না পায় তার। শিবনাথ অপমানের দুটো পাহাড় যেন তার সুমুখে খাড়া ক'রে দিয়ে গিয়েছে।

কিশোরী রাধার দিকে চেয়ে বলে, আমার ছেলে হ'লে তোমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবো ভাই—সরমার তো মেয়ে নেই। কি বল ?

সমাজ—সংসার—ছেলেমেয়ে—স্বামী। রাধা আর যেন সোজা হয়ে বসে থাকতে পারে না।

সরমার ছেলেটি বড় দুষ্টু। মায়ের কথাবার্তার মাঝখানে ঘরময় ছুটো-ছুটি করে—আর এটা ওটা নাড়ে। বার বার ধম্‌কে ধম্‌কে শেষে একটা চড় কষিয়ে দিল সরমা! কেঁদে উঠলো ছেলেটা।

কিশোরী আদর ক'রে কোলে তুলে নিল তাকে। সরমার দিকে চেয়ে হেসে ব'ললো, তোর ছেলেটা বড্ড ভারী সরমা—ওর বাপ কত ভারী রে!

হেসে উঠলো তারপর ওরা দু-জন—প্রাণপ্রাচুর্যের হাসি। নির্ভর আর সান্ত্বনায় ভরা।

যাওয়ার সময় কিশোরী ব'ললো, তুমি ভাই একটা মাদুলি নাও—দু-মাসের মধ্যেই আমি ফল পেয়েছি।

তারপর চলে গেল ওরা—ব'লে গেল, আবার একদিন আসবে।

ঘরটা হঠাৎ যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

হঠাৎ তার মনে হয়, সে যেন ভুলে ঢুকে প'ড়েছে অন্য কারুর ঘরে। সব কিছু সাজানো রয়েছে তার চারিদিকে—তবু সব যেন তার স্পর্শের বাইরে। শিবনাথ—সরমা আর কিশোরী। সবল একটি পুরুষ আর তার ভালোবাসা। একটি দুষ্টু ছেলে আর ছোট সংসার একটি। গোধূলির অন্ধকার ঘন হয়ে আসে ক্রমে। একা বসে বসে কত কি যে ভাবে রাধা। সরমা আর কিশোরীর সখিত্ব তার সঙ্কুচিত রুদ্ধ মনের দুয়ার খুলে দিল

আস্তে আস্তে। একটি যদি ছেলেই হয় তার, কি দোষ তাতে, কি ক্ষতি তাতে অন্যের ? দিগন্তশায়ী আকাশে একটুকরো নিরুদ্দেশ মেঘের মতো ভেসে চললো সেঃ তার কোন অতীত নেই, সমাজ নেই—সংসার নেই; শিবনাথ নেই। সে কিশোরী, সে সরমা। সন্তান-সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ সে, সে মা আর সরমার মত অহঙ্কারী। ছেলে বড়ো হবে, বিয়ে হবে তার—ঘর-সংসার ক'রবে। কেন ক'রবে না ? কিশোরী ওরা তো তাই ভাবে।

মা !

চমকে উঠলো রাধা। হঠাৎ কাকে যেন মনে পড়ে।

সরমার ছেলে। ব'ললো, মা এসেছিল না ?

রাধা ডাকলো, শোনো।

ছুটে পালালো ছেলেটা।

সন্ধ্যের পর শিবনাথ এল—সঙ্গে বেদিনী বুড়ী। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায় রাধার।

তারপর হঠাৎ রাধার কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল শিবনাথের। চাপা কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে উঠছে রাধা। বাইরে তখন অনেক রাত আর নিঃশব্দ অন্ধকার।

কি হ'ল রাধার ?

বিব্রত শিবনাথ রাধাকে শান্ত ক'রবার চেষ্টা করে।

ওকে চলে যেতে বলো—চলে যেতে বলো—

কে চলে যাবে ?

ওই বেদিনী বুড়ী।

চলে যাবে কি ! বরং কথা হয়েছে, বুড়ীকে ভালো ক'রে কাপড় দিতে হবে একখানি। সকালে উঠেই গঞ্জের হাটে যাবে শিবনাথ—ফিরতে হবে সন্ধ্যে। বুড়ী ব'লেছে, কোনো ভয় নেই—ফিরে এসে দেখবে শিবনাথ, রাধা ভালো হয়ে গিয়েছে।

সব শুনলো রাধা—আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো ছেলেমানুষের মতো।
জীবনের সমস্ত কান্না যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে আজ।

কম্প্রকণ্ঠে শুধু ব'ললো, না না—যেও না তুমি। বুড়ীকে চলে যেতে বলো।
টাকা-কড়ি যা চায়, নিয়ে চলে যাক বুড়ী ভোরে।

১৩৪৮

পিওন

হাটের একধারে ঝুরি-বাঁধা বটগাছটার তলে ছোটখাটো একটি জনতা পিওনের জন্যে উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা ক'রছে—বিরক্ত হ'য়ে উঠছে।

একজন অধৈর্য হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো। সুদূর পথের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে ব'ললো, আসবারও তো কোন নামগন্ধ দেখি না। সেই কখন থেকে বসে আছি—

ওদের সকলেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। সব আলোচনা বন্ধ ক'রে দিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকে ওরা কিছুক্ষণ। হাটের বেচাকেনা, দর-কষাকষি আর এক-আধটু কলহ—সমস্তটা মিলে একটা নিরবচ্ছিন্ন কলগুঞ্জনের সৃষ্টি হয়েছে। বটগাছের তলে অপেক্ষমান ছোট জনতাটিও আস্তে আস্তে আলোচনা আরম্ভ করে আবার: মহাযুদ্ধের গতি, জয়-পরাজয়, মৃত্যুর অভিনব যান্ত্রিক আয়োজন—যুদ্ধরত বীভৎস পৃথিবী। ওদের আলোচনার মুখর উত্তেজনা—আর হাটের একঘেয়ে কলগুঞ্জন হঠাৎ এক-একটা দমকা হাওয়ায় গ্রামান্তের নিঃশব্দ শূন্যতায় অস্ফুট আর্তনাদের মতো ছড়িয়ে পড়ে। হাটের পাশ দিয়ে ক্যানেল চলে গিয়েছে: কয়েকটি বিদেশী মহাজনি নৌকো নোঙর করেছে সেখানে। দু-একটি অলস গ্রাম্য কুকুর সশব্দে উত্তেজিত হ'য়ে উঠছে মাঝে মাঝে বিদেশী মুখ আর নৌকোগুলি দেখে। পশ্চিম দিগন্তে অন্তিম দিন বিষণ্ণ হ'য়ে এল।

তার পর দূরে পিওনকে দেখা গেল। কাঁধে ব্যাগ—মুখ নিচু ক'রে দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছে : ক্লান্ত আর ধূলিধূসর। বটগাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ালো সে—সকলে ঘিরে দাঁড়লো তাকে। অটল গাম্ভীর্যে নাম ডেকে ডেকে ব্যাগের একগাদা খবরের কাগজ আর চিঠি-পত্র বিলি ক'রে যায় পিওন।

নিবারণ রায়, কল্যাণপুর—

শশধর দাস, কল্যাণপুর—

মালতী দাসী C/o দ্বিজদাস সাঁতরা, সাতগাঁ

চিঠিপত্র নিয়ে আস্তে আস্তে ভিড় সরে গেল পিওনের চারপাশ থেকে। কারুর মুখ শুকনো, কারুর হয়ত সুখবর আছে—হাসিখুশি মুখ। আর এক-একটি খবরের কাগজ ঘিরে হাটের এখানে ওখানে উত্তেজিত জটলা : ইংলণ্ড, জার্মানী, রাশিয়া, সিঙ্গাপুর।

তাদের দিকে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো পিওন। কেউ ফিরে তাকালো না আর তার দিকে।

তার পর হাটের ভিড়ের মধ্যে অলসভাবে কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে বেড়ালো সে। চারপাশে তার মুখর জনতা আস্তে আস্তে কমে এল ; হাট ভেঙে এল। হাটের এক প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে রইলো সে—হাটের জনতা চলে গেল তার সুমুখ দিয়ে আস্তে আস্তে। নিঃশব্দে সে জনতার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তার পর পোস্ট আপিসের পথ ধরে মুখ নিচু ক'রে হন্ হন্ ক'রে ফিরে চললো আবার।

কিছু দূর এসে থমকে দাঁড়ালো সে।

পিওন—এই পিওন! ছোট মেয়ে একটি পাশের কেয়াবনের পথ ধরে ছুটে আসছে তার দিকে। কাছে এসে জিজ্ঞেস ক'রলো, চিঠি আছে পিওন?

কার চিঠি?

আমার দিদির!

পিওন একটু বিব্রত বোধ করে, ভালও লাগে। হেসে ব'ললো, তোমার দিদির চিঠি তো বুঝলুম, কিন্তু নাম না ব'ললে কি ক'রে জানবো!

বাঃ, দিদির নাম জান না তুমি!

পিওন সহাস্যে অক্ষমতা জানালো মাথা নেড়ে।

কিন্তু পিওনের সকলকে চেনা উচিত, পৃথিবীর সকলকে: মেয়েটি হতাশ আর অবাক হ'য়ে পিওনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তার পর আস্তে আস্তে ব'ললো, আমার দিদির নাম মুকুল।

আর তোমার নাম? সকৌতুকে জিজ্ঞেস ক'রলো পিওন।

বাঃ, আমার নামও জানি না তুমি!

না তো!

বাঃ, সবাই তো জানে—আমার নাম পুতুল!

ঠিক ঠিক—এবার মনে পড়ছে বটে। পিওন গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে নেড়ে ব'ললো। তার পর হেসে জিজ্ঞেস ক'রলো, তোমাদের বাড়ী কোন্‌টা?

ওই তো কেয়াবনের ওপাশে।

তার পর অনেক কথা ব'লে মেয়েটি: শহর থেকে নতুন এসেছে তারা এখানে, পালিয়ে এসেছে বোমার ভয়ে। তার দিদির বিয়ে হয়েছে এই সবে চার-পাঁচ মাস। দিদির বর থাকে শহরে, চাকরি করে—পুতুলের বাবাও চাকরি করে সেখানে।

এমনিতরো অনেক কথা অনর্গল ব'লে চলে মেয়েটি। শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে পিওন। তার পর হঠাৎ মনে পড়ে যায়: পোস্ট আপিসের কিছু কাজ তখনও তার বাকী; ফিরে গিয়ে সেটুকু সেরে নিতে হবে। কাল ভোরে আবার ছুটতে হবে নদীচরের হাট—আজ ফিরে গিয়েই চিঠিপত্র গুছিয়ে নিতে হবে। তার পর রাঁধা-খাওয়া। সে একা, সব তাকে নিজেকেই ক'রে নিতে হয়।

পথের পাশের দিগন্তছোঁয়া মাঠে অন্ধকার ঘন হ'য়ে এল।

পিওন ব'ললো, তোমার দিদির চিঠি এলে তখন দেবো।

তার পর পোস্ট আপিসমুখো এগিয়ে চললো সে হন্ হন্ ক'রে।

পেছন থেকে পুতুল ডেকে ব'ললো, কাল আসবে তো পিওন ?

তার পর ভোর থেকে আবার সেই মুখ নামিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলা ; দিনের পর দিন।

একটি ছোট মেয়ে কোথায় কোন্ কেয়াবনের পাশে তার জন্যে অপেক্ষা করছে—সারা দিনের দ্রুত ধাবমান মুহূর্তগুলির মধ্যে একবারও মনে পড়লো না তাকে। দূর গ্রাম-গ্রামান্তরের হাট আর তার মধ্যে অপেক্ষমান উৎকণ্ঠিত জনতা। পোস্ট আপিস আর তারই পাশ ঘেঁষে তার থাকবার ঘরটুকুতে কয়েক ঘণ্টার নিঃসঙ্গ বিশ্রাম। কোথা থেকে বদ্‌লি হ'য়ে এসেছে সে এখানে—আত্মীয়-পরিজনবিহীন প্রবাসী। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত শুধু তার দ্রুত ধাবমান ভারবাহী দিনগুলি।

তার পর এক দিন মুকুলের চিঠি এল।

সেই কেয়াবনের পাশটিতে তার দেখা হ'ল পুতুলের সঙ্গে।

পুতুল ব'ললো, ক'দিন কোথায় ছিলে পিওন ? আমার দিদির চিঠি কোথায় ?

চিঠি—না ?—কিছু যেন মনে ক'রবার চেষ্টা করে পিওন। তোমার দিদির নাম কি বল ত।

বাঃ এরই মধ্যে তুমি ভুলে গিয়েছ সব ! সেদিন ব'ললুম যে, আমার দিদির নাম মুকুল !

আবার যেন নতুন ক'রে আলাপ হয় ওদের। মেয়েটিকে নতুন ক'রে ভাল লাগে পিওনের। কত রকমের অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে পুতুল : বিরাট পৃথিবী, দেশ-দেশান্তর আর যুদ্ধ।

কেয়াবনের ধারে রোজ সে দাঁড়িয়ে থাকে পিওনের জন্যে। কিন্তু প্রত্যেক দিনই মুকুলের চিঠি আসে না—পিওনও আসে না রোজ। তবু সে দাঁড়িয়ে

থাকে। বেলা যখন শেষ হ'য়ে আসে তখন পিওনকে দেখা যায় কোনো কোনো দিন : দূর মাঠের ওপাশের পথ দিয়ে পোস্ট আপিসের দিকে মুখ নিচু ক'রে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে।

পি-ও-ন ...

চিৎকার ক'রে ডাকে পুতুল—আর হাত নাড়ে।

পিওনও হেসে হাত নাড়ে : ভাল লাগে তার এই ফুটফুটে মেয়েটিকে।

কোন কোন দিন সে কেয়াবনের পাশ দিয়েই ফেরে।

আজ অনেক দূর থেকে তুমি এলে—না পিওন? পুতুল জিজ্ঞেস করে। কোন্ দিকে গিয়েছিলে আজ?

ওই দিকে।

কত দূর মাঠের পর মাঠ—আর দিগন্তের কোলে ঝাপসা বনরেখা। সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পুতুল বলে, অনেক দূর—না?

কল্পনায় পুতুলের পৃথিবী নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছে সেখানে।

ওঃ, কত দূরে তুমি যাও পিওন! তোমার ভয় করে না? আচ্ছা, ওখানে লোক আছে?

পুতুলের সে এক গল্পের পৃথিবী। অনভিজ্ঞ ছোট্ট এই মেয়েটিকে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা—অনেক গল্প বলে সে। ভারী কৌতুক বোধ করে।

তুমি রোজ কেন আস না পিওন! পুতুল ঠোঁট ফুলিয়ে বলে। তোমার জন্যে আমি রোজ দাঁড়িয়ে থাকি।

তার পর রোজ আসে পিওন—ফেরার পথে কেয়াবনের পাশ দিয়ে ঘুরে যায়। বিকেলে কেয়াবনের বিষণ্ণ ছায়ায় একটি নতুন জগৎ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। কর্মক্লান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাস-জীবনের পরিশ্রান্ত আর বিশ্রামকাতর বিকেলগুলি পিওনের, কেয়াবনের একপ্রান্তে এসে পুতুলের অসংখ্য কল-কাকলীতে ভরে যায়।

জান পিওন, আজ একটা শেয়াল দেখেছি—এই এক্ষুনি! আমাকে দেখে কেয়াবনের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে গেল।

ওটা শেয়াল নয়—ভূত।

ভূত!

হুঁ, আসতে আসতে আমিও দেখলুম কি-না। শেয়ালটা একটা ঘোড়া হ'য়ে গেল। যেমনি চড়তে যাব, অমনি সেটা একটা মাছি হ'য়ে উড়ে পালালো।

তার পর?

তার পর এই চিঠিখানা তোমার দিদিকে দেওয়ার জন্যে ব'লে গেল।

মুকুলের চিঠি এসেছে।

অনেক চিঠি পায় মুকুল স্বামীর কাছ থেকে—কখনও কখনও সপ্তাহে দু-খানি।

ওঃ, দিদি কত চিঠি পায়! পুতুল হঠাৎ বলে, আমাকে একখানা চিঠি দেবে পিওন?

তোমার চিঠি কোথায়!

পিওনের ব্যাগটা দেখিয়ে ব'ললো পুতুল, ওতে তো কত চিঠি আছে। দাও না আমাকে একখানা।

ওসব অন্য লোকের চিঠি। তোমার চিঠি যখন আসবে তোমার দিদির মত—তখন দেবো।

চুপ ক'রে রইলো পুতুল। তার পর ঠোঁট ফুলিয়ে ব'ললো, আমাকে কেউ চিঠি লেখে না। দিদির মত তুমিও তো অনেক চিঠি পাও—না পিওন?

পিওন চুপ ক'রে রইলো। কর্মচঞ্চল অনেক দিনের পরিচিত গ্রামগ্রামান্তর, ঘরগুলি, পথ-ঘাট-মাঠ এত দিন পরে হঠাৎ অপরিচিত আর সুদূর ব'লে মনে হয়। মনে হয়, ভয়ানক একা সে—আর শুধু নিরবচ্ছিন্ন ভারবাহী দিনের পর দিন।

পিওন আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে ব'ললো, তোমার মত আমিও কোন চিঠি পাই না পুতুল।

পুতুল চুপ ক'রে রইলো কিছুক্ষণ। তার পর হঠাৎ সে ছলছল্ ক'রে হেসে

উঠলো। মাথা নেড়ে নেড়ে ব'ললো, সে বেশ মজা হবে। আমি যদি তোমাকে চিঠি লিখি—তুমি উত্তর দেবে তো পিওন ?

পুতুলের উল্লাস-উচ্ছল মুখের দিকে চেয়ে ম্লান হেসে পিওন ব'ললো, দেবো।

হাট-ফিরতি একটি লোক যাচ্ছিল পথ দিয়ে। পিওনকে দেখতে পেয়ে ব'ললো, ওদিকে খবরকাগজের জন্যে সবাই যে গরম হয়ে উঠছে হে পিওন—তাড়াতাড়ি যাও।

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালো পিওন।

পেছন থেকে পুতুল ডেকে ব'ললো, ফিরে আসবে তো পিওন ?

আসবো। একটু হেসে জবাব দিল সে। তার পর এগিয়ে চললো হাটমুখো।

কাগজ আর চিঠি-পত্র বিলি ক'রে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে পিওন। নতুন একটা উত্তেজনা ও আতঙ্কের মাঝখানে হঠাৎ কেমন যেন তারও ভয় করে : যুদ্ধ এগিয়ে আসছে।

হাটের এখানে ওখানে জটলা হয় খবরকাগজগুলি ঘিরে। ক্যানেলে আর খালের মুখে ভিড় নেই হাটুরে নৌকোগুলির। হঠাৎ অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছে সেগুলি সরকারী নিষেধাজ্ঞায়। মহকুমার একান্তে বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে আর এখানে ওখানে পড়েছে নতুন নতুন ছাউনি। সেখানে অদ্ভুত বেশ-বাস আর বিদেশী যতো মুখ। জেলা বোর্ডের সড়ক দিয়ে অদ্ভুত ধরনের মোটরগুলো ছুটে যায় হু হু ক'রে। অসংখ্য ঘটনার ঘূর্ণাবর্তে নির্জন গ্রামপ্রান্তের এই প্রাণীগুলি যেন হঠাৎ ঘুরপাক খেতে লাগলো খড়কুটোর মত।

হাটের মাঝখানে বেশীক্ষণ থাকতে ভালো লাগে না পিওনের। বিকেলের ছায়াম্লান নির্জন কেয়াবনের পাশটি আকর্ষণ করে তাকে।

পুতুল দাঁড়িয়েছিল তখনও কেয়াবনের ধারে। পিওনকে দেখতে পেয়ে ব'লে উঠলো, উঃ, কত পাখী পিওন, দেখ দেখ—

দিনান্তের পশ্চিম দিগন্ত কালো ক'রে এক ঝাঁক পাখী উড়ে আসছে।

ওগুলো কি পাখী পিওন ?

কাঁক। সমুদ্রের ধারে থাকে। উড়ে পালিয়ে আসছে।

কেন ?

সেখানে যুদ্ধ হবে ব'লে সৈন্যেরা গিয়ে সব তোড়জোড় ক'রছে কি-না। লোক-জনের গোলমালে ভয়ে উড়ে পালিয়ে আসছে। আজ ক'দিন ধ'রেই পালিয়ে আসছে ওরা।

কোথায় যাচ্ছে ?

বিব্রত হয়ে পিওন হেসে ব'ললো, যেখানে কোন গোলমাল নেই—যুদ্ধ নেই।

সে কোথায় ?

জানে না পিওন।

তুমি জান না পিওন! তুমি ত অনেক দূরে যাও!

পিওন নিঃশব্দে শুধু মাথা নাড়লো।

পাখীগুলোর দিকে চেয়ে রইলো পুতুল অনেকক্ষণ।

আস্তে আস্তে ব'ললো, ওরা পালিয়ে যাচ্ছে—না ?

হ্যাঁ, পালাচ্ছে।

চুপ ক'রে রইলো পুতুল। তার পর ব'লে উঠলো, আমরাও চলে যাবো এখান থেকে।

হঠাৎ যেন চমকে উঠলো পিওন। ব'ললো, কোথায় যাবে আবার ?

মামার বাড়ীতে যাবো। এখানেও তো যুদ্ধ হবে—না পিওন ?

পিওন চুপ ক'রে রইলো। কিছুই যেন হঠাৎ ভালো লাগে না আর তার।

পুতুল বকর বকর করে, তুমি রাগ ক'রলে পিওন ? কিন্তু কি ক'রবো বলো, আমাদের যেতেই হবে। মা ব'লেছে। এখানে তো আমাদের নিজেদের বাড়ী নয়। কাকাদের বাড়ী। বাবা টাকা কড়ি পাঠাতে পারে না মাসে মাসে। বেশী মাইনে তো পায় না বাবা। ···

অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘন হ'য়ে আসে কেয়াবনের ধারে। জগতের যত চেনা-

অচেনা সমস্ত মুখগুলোকে হঠাৎ ভয়ানক অনাত্মীয় মনে হয় তার। ভালো লাগে না আর এই কেয়াবনের ধারে বসে' থাকতে।

তবু সে আসে কেয়াবনের ধারে।

হঠাৎ একদিন পুতুল তার হাতে একখানা ভাঁজ করা ছোট কাগজ গুঁজে দিয়ে হাসিতে উছলে প'ড়ে ছুটে পালালো।

কাগজটার ভাঁজ খুলে দেখলো পিওন। আঁকা বাঁকা বড় বড় অক্ষরে পুতুলের চিঠি : পিওন তুমি বড় ভাল লোক।

মুখ তুলে চারদিকে তাকালো পিওন। পুতুলকে দেখা গেল না কোথাও। চিঠিখানি পকেটে পুরে পোস্ট আপিস মুখো হেঁটে চললো সে।

হঠাৎ পেছন থেকে পুতুল চিৎকার ক'রে ব'ললো, কাল আমার চিঠির জবাব দেবে পিওন।—দিদির মতো ··· সেই রকম নীল খামে।

পিওন হেসে ব'ললো, দেবো।

তার পর পিওনের চিঠি পাওয়ার আগেই পুতুলরা চলে গেল সেখান থেকে।

কেয়াবনের পাশে বিকেলের বিষণ্ণ আলোটুকু নিঃশব্দে নেমে এলো দিনের পর দিন—আর অন্ধকারে ম্লান হ'য়ে গেল হারিয়ে।

বিকেলটা হঠাৎ কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে কয়েক দিন পিওনের—ভারাক্রান্ত আর নিঃসঙ্গ। মনে হয়, কোনো কাজ নেই—তবু কিছু যেন একটা করার আছে। তারপর দীর্ঘ দিনের পরপারে এসে ফাঁকটুকু ভরে' ওঠে আবার ধীরে ধীরে। সে যেন অনেক দিনের কথা—

হঠাৎ মনে পড়ে না। নিঃশব্দে মুখ নিচু ক'রে কাঁধে চামড়ার ব্যাগটা ঝুলিয়ে সেই কেয়াবনের পাশ দিয়ে অনেক দিন চলে গেল পিওন হাটের দিকে।

একদিন একটি বুড়ো কেয়াবনের ধারে হঠাৎ ডাক দিল পিওনকে।

থমকে দাঁড়ালো পিওন।

কোনো চিঠি আছে না-কি দেখো তো পিওন আমার নামে।

না দেখেই পিওন অভ্যাস মতো উত্তর দিল, না।

পিওনের এ অভ্যাস গ্রামের সকলের জানা। লোকটা পথে চিঠি-পত্র বিলি করে না—একেবারে হাটে গিয়ে হাত দেয় চিঠির বাণ্ডিলে।

বুড়ো পথ ছাড়ে না। বলে, হাটে আর যাবো না ভাই—দাও এইখানে। চিঠি নিশ্চয়ই আছে। পুতুলের অসুখ—আগে চিঠি পেয়েছিলুম একখানা। পুতুলকে তো চিনতে তুমি।

কার অসুখ ব'ললেন? কানখাড়া ক'রে পিওন চিঠির বাণ্ডিলটা বের করে ব্যাগের ভেতর থেকে।

পুতুলের। কলেরা হ'য়েছিল সেখানে গিয়ে।

কি নাম?

মাখন গাঙ্গুলী।

একখানা খাম টেনে বের ক'রলো পিওন। খামখানা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

চিঠি পড়া শেষ হ'লে জিজ্ঞেস ক'রলো, কি খবর?

মারা গেছে মেয়েটা। বিদেশ বিভুঁয়ে গিয়ে ·

কথাটার শোনার অপেক্ষা করে না আর পিওন। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললো সে একটা ভারী নিঃশ্বাস ফেলে।

সে যেন অনেক দিনের কথা। ···

মুখ নিচু ক'রে হেঁটে চলেছে পিওন। হঠাৎ চমকে ওঠে বন্দুকের শব্দে। দূরে কোথায় যেন বন্দুকের আওয়াজ হ'লো।

এক ঝাঁক খড়হাঁস উড়ে আসছে সমুদ্রতীর থেকে। একটা ঘুরতে ঘুরতে পড়ছে মাটিতে পোস্ট আপিসের ছাউনির কাছে।

হঠাৎ মনে পড়ে পিওনের—একটা চিঠির জবাব দেওয়া হয় নি তার।

১৩৪৯

রাত্রির লেখা

বিরাট একটা ধানের স্তূপ পুড়ে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যায়, পোড়ে দু-তিন দিন ধরে'। সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়ে যায় পূবের হাওয়ায় পশ্চিম দিগন্তের দিকে শরতের নিরুদ্দেশ মেঘের মত। সেই ধোঁয়ার দিকে চেয়ে চেয়ে নোংরা হলুদে দাঁত বের ক'রে হাসে ফাটা মাঠের মত কঠিন মুখগুলো। হাসে আর দল পাকায়, থানার ভগ্নস্তূপে বসে থুতু ছিটোয়। তীব্র জ্বরের মত একটা স্বাধিকারের উন্মাদনা যেন হাঁপর টানে বুকের মধ্যে। আর কি ক'রবে তারা? কঠিন দুই হাতে একটা অনড় অটল পাহাড়কেও ছিঁড়ে এনে ডুবিয়ে দিতে পারে কোথাও যেন।

তারপর অসংখ্য গুজবের আচ্ছন্নতা নামে। গ্রামের পর গ্রাম জলেপুড়ে খাক্ হ'য়ে গেল, এ গ্রামও বাদ পড়বে না। ছোট ছেলেমেয়েগুলো সভয়ে চেপে ধরে মায়েদের হাত, মেয়েরা তাকায় পুরুষদের দিকে। আর পুরুষেরা মুখ চাওয়া-চাউয়ি করে পরস্পরের। সারা গ্রামটা হঠাৎ থম্ থম্ করে অর্জুন আর করঞ্জার বনের মধ্যে।

এর উপরে নবীন নিয়ে এল কোথা থেকে পুলিস আসবার খবর, সঙ্গে আসছে একদল ফৌজ। সারা গাঁয়ে খবরটা ছড়িয়ে দিয়ে নিজের ঘরের দাওয়ায় এসে বসলো গুম্ হ'য়ে।

তাকে এই ভাবে বসে থাকতে দেখে তারিণী বলে, কি হলো! মাথা ঘুরে গেল নাকি! জল দেবো?

ভাল লাগে না তারিণীর ওই ধরনের কথা বলার ভঙ্গী। পুলিস আসছে—এ কথা শোনে নি নাকি সে! চুপ ক'রে বসে থাকে নবীন আর ভাবে, তারিণীকে কোথায় নিরাপদে রেখে আসা যায়।

তারিণী বলে, হ্যাঁগো, পুলিস আসছে নাকি?

তবে শুনেছে তারিণী কথাটা!... এমন ভাবে কথা বলে তারিণী! নবীন শুধু বলে, হুঁ ...

শাঁখ বাজাবো? বেরোবে না তুমি?

বেরো তুই নিজে। আমার কি—আমার দু-হাত দু-পা। চল তোকে তোর বাপের বাড়ীতে রেখে আসি। কখন এসে পড়বে তার ঠিক নেই।

সে তো আজ কবে থেকে শুনছি—আসছে। রাতে একটু ঘুম নেই। ছেলেমেয়ের হাত ধরে' এ-গাঁয় ও-গাঁয় বনে বাদাড়ে ঘোরা। এসে পড়লেও তো বাঁচি।

হুঁ, বাঁচবি! শুনেছিস তো—মেয়েমানুষের ইজ্জৎকে রেয়াৎ করে না তারা!...

আমার ভয় কি। আমি তো ঘুরবো তোমার সঙ্গে সঙ্গে। স্বোয়ামী যার পাঁচ জনকে ভরসা দেয়—তার আবার ভয় কি!

আগুনে যেন ঘি পড়ে। তারিণীর চটুল ইঙ্গিতে চটে ওঠে নবীন। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ বুকের মধ্যে একটা অশরীরী যোয়ান যেন লাফ দিয়ে ওঠে। বলে, তুই মেয়েমানুষ—বুঝবি কি তার। আমার এই দু-হাতের হিসাব রেখে এসেছি থানায়, পোস্টাপিসে—সকলে মনে মনে জানে ভালো ক'রে।

তারিণী হাসে মুখ টিপে টিপে।

হাসছিস! রাজে কথা বলে না নবীন। ধর, তুই লাঠি।

কোমরে একটা হাত দিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে ভুরু কুঁচকিয়ে বলে তারিণী, কেন—লড়বে? বলে কোথায় হুমড়ি খেয়ে পড়বে তার ঠিক নেই। ব'লে মুখ টিপে হাসতে হাসতে চলে যায় সে সেখান থেকে। বলতে বলতে যায়, আমি কিন্তু এক পাও নড়ছিনে তোমার কাছ থেকে।

বিব্রত আর হতাশ হয়ে বসে পড়ে নবীন আবার দাওয়ায়।

আসন্ন বিপদ একটাকে যেন আমলই দেয় না তারিণী।

যে জেদি মেয়ে—সত্যিই যদি না যেতে চায়! মহা ভাবনায় পড়ে যায় নবীন, আর একটা নিরুপায় অসহায়তা বুকের মধ্যে টন টন করে তার। তারিণীকে রক্ষা ক'রবার কোন ক্ষমতা যেন আর নেই তার হাতে। শুধু বসে বসে ভাবা আর চোখ তুলে চেয়ে থাকা।

দূরের মাঠে অন্ধকার ঘন হ'য়ে এলো।

পুলিস আসবার খবর শুনে পাশাপাশি চার-পাঁচটা গ্রামের পথে পথে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের হাত ধরে' নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ে ছোট ছোট দল নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। কোন্ গ্রামে তারা আসবে কে জানে। তারা আসবে—রুখতে পারবে না কেউ আর। সন্তর্পনে হাঁটে মেয়েরা—কথা কয় ফিস্ ফিস্ ক'রে—ছোট ছেলেমেয়েগুলোর মুখে গুঁজে দেয় স্তনের বোঁটা, যাতে কেঁদে না ওঠে। জনশূন্য হ'য়ে যায় গ্রামের পর গ্রাম। একটা ভয়াবহ নির্জনতা যেন কোন প্রেতলোকের দুয়ার খুলে দেয়।

নবীন তারিণীকে তাড়া দিয়ে ব'ললো, ব'সে রইলি যে—ওঠ্। যা গুছোবার গুছিয়ে নে। গাঁ ছেড়ে চলে গেল সকলে।

কিসের জন্যে এই কুকুর-বেরালের মত ঘোরা বাপু?

তারিণীর কণ্ঠে একটা ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ ফেটে পড়লো। চুপ করে থাকে নবীন। কি উত্তর আর দেবে সে এর।

তারিণী ব'লে চলে, তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে—এখন পেছুও কেন? বড়মুখ ক'রে সভা ক'রেছিল যারা তারা এখন গেল কোথায়?

নবীন চটে যায়, পাশে পেছনে কোনো অবলম্বন দেখতে পায় না সে। তারিণীকে ধমকে বলে, তুই মেয়েমানুষ—অতো কথায় দরকার কি তোর। ওঠ্ তুই।

আমি যাবো না।

আশ্চর্য! গলা যেন কাঁপে তারিণীর। ম্লান আলোয় নজর ক'রে দেখে নবীন—চোখ ছলছল ক'রছে তারিণীর। কাঁদে কেন তারিণী! ব'ললো, তা তুই কাঁদছিস কেন?

তারিণী নিরুত্তর! শুধু ফোঁস ফোঁস করে! আঁচলে মুখ ঢেকে সত্যিই কাঁদে তারিণী।

বিব্রত নবীন বলে, সবাই চলে গেল গাঁ ছেড়ে আর তুই বসলি কাঁদতে। কান্নার আছে কি এতে?

ভীরু চোখ তুলে তারিণী বলে, পুলিসের সঙ্গে মারামারি ক'রবে না বলো।

এই কথা! ···

শুনে খুশি হয় নবীন মনে মনে। একটা ঘা খাওয়া পৌরুষ মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে জীর্ণ বুকের মধ্যে। নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে নবীন, সে দরকার হ'লে ক'রতে হবে বৈ কি।

আরও যেন ভয় খেয়ে যায় তারিণী। নবীনকে সে চেনে ভয়ানক গোঁয়ার বলে। তারপর এই একমাসের মধ্যে কত কি যে হয়ে গেল—কত সভাসমিতি, কত শাঁখের ডাক আর বন্দুকের আওয়াজ। সে ত জানে, সাবিত্রীর স্বামী মারা গিয়েছে, গোকুল কোথায় নিখোঁজ। তবু কেন জানি না, একটা যেন আশ্বাস ছিল, নির্ভর ছিল নবীনের মুখের দিকে তাকিয়ে। কত কথা শুনেছে সে নবীনের মুখ থেকে—কত ভাঙাভাঙি আর আগুন লাগানোর কথা। আজ সেইগুলো যেন বিভীষিকার মত মনে হয়। নবীনের শঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে বুক তার কেঁপে উঠে আশঙ্কায়, পালাতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু

তার অনুপস্থিতিতে এই গোঁয়ার্ মোকটার কিছু একটা হয়ে যায় যদি! যেতে ইচ্ছে করে না আর তারিণীর।

বলে, আমি যাবো না। বরং এইখানে কোথাও লুকিয়ে থাকবো।

সব্বাই চলে গেল আর তুই থাকবি! ছেলেমান্‌ষি করিস নি—নে চল্‌।

তা হলে আগে কথা দাও তুমি। বলো গা ছুঁয়ে ···

নবীনের জীবনে এ ভারি বিশ্রী সমস্যা। একটা রোগা কালো মেয়ের সভয় কণ্ঠস্বর আর ভীরু সশঙ্কিত দৃষ্টি যে এত ভালো লাগে—আর তাকে বেষ্টন ক'রে বলতে ইচ্ছে করে না : না—সে মারামারি ক'রবে না। একটা নিরস্ত্র অবরুদ্ধ শক্তি যেন লাফ দেয় বুকের মধ্যে। কিন্তু জেদ ধরে বসেছে তারিণী। অগত্যা আশ্বাস দিয়ে বলে নবীন :

আচ্ছা আচ্ছা, কথা দিলাম। নে ওঠ্‌।

তারপর একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে কাপড় চোপড় ঘটিবাটি পুরে সেটি মাথায় ক'রে নবীন চললো তারিণীকে নিয়ে।

বাপেরবাড়িতে তারিণীকে পৌছে দিয়ে নবীন যখন ফেরবার উপক্রম ক'রলো তখন হাউমাউ ক'রে কেঁদে তারিণী পা জড়িয়ে ধরলো নবীনের। থেকে যাক নবীন।

বিব্রত নবীন ব'ললো, থাকবার উপায় থাকলে থাকতাম—এ বুঝিস না কেন তুই! পুলিস এসে খোঁজ ক'রবে বড়লোকের বাড়ি। মানে, অবিনাশবাবুর বাড়ি। বাবু হাতে ধরে বলেছে, নবীন তুমিই ভরসা। আমি থাকি কি ক'রে। গ্রাম পাহারা দিতে হবে। তা ছাড়া অবিনাশবাবু ··· উঁহু—সে হয় না।

তুমি নাই বা গেলে, আরও তো লোক আছে।

অদ্ভুত একটু হাসি হেসে বলে নবীন, তারা শুধু ওই নামেই আছে। তা ছাড়া অবিনাশবাবু, আর সব বাবুরা আমাদের নিয়ে এত সব কাণ্ড করলেন, আজ তাদের বিপদের দিনে থাকবো না! ··· খোঁজ খবর নিয়ে ভোরে এসে নিয়ে যাবো তোকে—ভাবিস নি।

ব'লতে ব'লতে পথে নেমে পড়লো নবীন। অদৃশ্য হ'য়ে গেল অন্ধকারে।

তারিণী বসে রইল ভোরের অপেক্ষায় অন্ধকারে চোখ মেলে দিয়েঃ কখন সে যাবে আবার এখান থেকে। কি অবস্থায় দেখবে গিয়ে? মাথাটা থেঁৎলে গিয়েছে হয়ত লাঠির ঘায়ে অথবা সাবিত্রীর স্বামীর মত মুখ থুবড়ে পড়ে আছে জলার ধারে। বুক কেঁপে ওঠে তারিণীর আর বার বার প্রার্থনা করেঃ তার স্বামীর যেন কোন বিপদ না হয়—হে ভগবান!···

ভোর হতে তখনও অনেক দেরি। তারিণীর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো। অধরের কাছে কেঁদে ব'ললো, আমাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে চল দাদা।

সে কি! পুলিস আসবে ব'লে যে নবীন রেখে গেল রে! ভোর হোক—তারপর না হয় ···

কেন, পুলিস কি এখানে আসতে পারে না!

আঃ, এ কথাটা নবীনকে বলে নি কেন সে আগে! আফশোষ হয় তারিণীর।

অধর ব'ললো, আসতে পারে বৈ কি। তবু কিছুটা দূর তো বটে।···

না দাদা, তোমার পাড়ে পড়ি—আমাকে রেখে আসবে চল। বরং মরবো সেইখানে।···

কান্নাকাটি আরম্ভ ক'রে দেয় তারিণী।

তা হ'লে এলি কেন!···যতো মেয়েমানুষের কাণ্ড!

আবার সেই কাঠের বাক্সটি মাথায় ক'রে আগে আগে চললো অধর—পেছনে তারিণী। সঙ্গে ডাকাডাকি ক'রে নিয়ে এলো জনচারেক লোককে।

কেউ আপত্তি করে না। আপদের সঙ্গীর যত ব্যবধান ছিল সব যেন দূর হ'য়ে গিয়েছে এই এক মাসের মধ্যে। রাতবিরাতে ঘোরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে—চুপি চুপি কথা কয়, স্বাধিকারের স্বপ্ন দেখে।

গ্রামে ঢোকবার পথের মোড়ে মোড়ে গাঁয়ের জোয়ান ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে চার-পাঁচজন ক'রে—সকলেরই হাতে একটি ক'রে শাঁখঃ বিপদ সুমুখে এলেই জানানি দেবে শাঁখ বাজিয়ে।

ঢুলুনি আসছিল নবীনের। হঠাৎ কুঞ্জর ঠেলা খেয়ে চমকে ওঠে।

কি হ'লো!

ফিস্ ফিস্ ক'রে কুঞ্জ ব'ললো, ওই যে ···

অদূরে একটা ছায়ামূর্তি যেন এগিয়ে আসছে সন্তর্পণে। একা আসছে—পুলিস হয়তো নয়, এই গ্রামেরই হয়তো কেউ—পুলিসের চর হ'তে পারে। এ গ্রামের যে কেউ হ'তে পারে—কারুকেই বিশ্বাস ক'রতে পারে না তারা। লাঠিতে হাতের মুঠি শক্ত হয় নবীনের!

চিৎকার ক'রে বলে এরা, কে রে!···

হেই বাবা।···

অস্পষ্ট মূর্তিটা হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠলো। হাত থেকে খসে পড়ে গেল তার লাঠিটা আর সর্বাঙ্গে ঢাকা চাদরের ভেতর থেকে পড়লো একটা ঘটি আর সানকি। ব'ললো, আমি রামদাস বৈরাগী।

কুঞ্জ হেসে বলে, তুমি অন্ধ মানুষ বৈরাগী—এই আঁধার রাতে তুমি বেরিয়েছ কেন?

আর বাবা—পুলিস আসছে যে! চলবার কি আমার গতর আছে! সন্ধ্যে থেকে বোষ্টমী যে কোথায় গেল!··· সবাই চলে যাচ্ছে শুনে ···

শেষ সম্বল ঘটি আর সানকিটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বৈরাগী!

কুঞ্জ ব'ললো, চল বৈরাগী—ইস্কুলে রেখে আসি তোমাকে। বোধ হয় পুলিস সেখানে যাবে না।

নবীন গম্ভীরভাবে বলে, ইস্কুলে না—তার চেয়ে ··· তার চেয়ে বারোয়ারী তলায় রেখে আয়!

কুঞ্জ চলে যায় বৈরাগীকে নিয়ে।

তারিণীর কথা মনে মনে ঘোরাফেরা করে নবীনের। নিরুপায় ক্ষুব্ধতায় কি যেন তোলপাড় করে তার বুকের মধ্যে। যদি সেখানে যায় পুলিস। অসহায়-ভাবে চেয়ে থাকে অন্ধকারের দিকে নবীন।

তারপর রাত গভীর হ'তে গভীরতর হ'ল। ভীতার্ত নরনারীর পথ চলা থেমে গিয়েছে বহুক্ষণ। জনশূন্য গ্রামটা গভীর অন্ধকারে শুধু ঝিম্ ঝিম্ ক'রছে। বহুদূর থেকে টানা কান্নার মতো একটা কুকুরের ডাক ভেসে আসে। অন্ধকারের গভীরতাকে আরও গভীর আরও ভয়ঙ্কর ক'রে তোলে। মনে হয়, যতদূর চোখ যায়—গ্রামের পর গ্রামে একটাও জনপ্রাণী যেন নেই—শুধু ওই একটা কুকুর ছাড়া—আর সব যেন শেষ হ'য়ে গিয়েছে।

নবীনের আবার ঢুলুনি আসে—তার সঙ্গী সাথীদেরও। অরাজক রাজ্যের মত প্রচণ্ড একটা উদ্যত ভয়াবহতা বহুক্ষণ সজাগ রেখেছিল তাদের। কিন্তু তারও যেন একটা সীমা আছে। আধো তন্দ্রায় মনে মনে জিজ্ঞেস করে তারা: কেন এই কষ্ট! কাকে পাহারা দিচ্ছে তারা?…

হঠাৎ একটা দিগন্তভেদী আর্তনাদ যেন চিড় খেয়ে যায় অন্ধকারে বিদ্যুতের মত। বহু দূর থেকে বহু দূরে মিলিয়ে যায় শব্দটা।

তন্দ্রা ছুটে যায় ওদের। মুখের কাছ পর্যন্ত শাঁখটা উঠে আবার নেমে যায়। আশ্চর্য—আর তো কিছু শোনা যায় না! উৎকর্ণ হয়ে শোনে ওরা। সপ্রশ্ন জোড়া জোড়া চোখ মেলে দিয়ে তাকিয়ে থাকে পরিব্যাপ্ত সুমুখের অন্ধকারের দিকে। যেন উত্তর পাওয়া যাবে সেখান থেকে।

কিন্তু অন্ধকার যেন পাথর হ'য়ে গিয়েছে।

হঠাৎ নবীনের চোখ পড়ে—কয়েকটা লোক যেন ছুটে আসছে ঊর্ধ্বশ্বাসে তাদের দিকে। মুহূর্তে খাড়া হ'য়ে দাঁড়ালো সকলে। তারপর তারাও ছুটতে শুরু করে গ্রামের দিকে—প্রাণপণে ফুঁ দেয় শাঁখে। পাশাপাশি ঝুপসি জঙ্গল থেকে সাড়া দেয় অসংখ্য শাঁখ। তারপর একটানা একটা শঙ্খরোল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বহুদূরে মিলিয়ে যায়। তার মাঝখানে বুকগুলো কাঁপে—অসংখ্য অসহায় বুক—আর অন্ধকারও যেন কাঁপে থর থর ক'রে।

ছুটে আসা লোকগুলো হু হু ক'রে ছুটে চলে গেল নবীনের ঘরের দিকে।

নবীনের ঘরের দাওয়ায় বসে বসে হাঁপায় তারা। তারপর দম নিয়ে ডাকে চেঁচিয়ে টেনে টেনে :

ন…বী…ন…

নিঃশব্দ অন্ধকারে সে ডাক তরঙ্গিত হ'য়ে কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে যায়। গ্রামের বনজঙ্গলের নিরাপদ আশ্রয় থেকে সকলে প্রতীক্ষা করে একটা চরম কিছুর। তারপর অবাক হয় তারা : কারা ছুটে এলো অমন ক'রে! কে ডাকে ?…

নবীনের কেমন অদ্ভুত লাগে : কে ডাকে তার নাম ধরে! তারিণীর দাদা অধরের গলা না ?

কুঞ্জ ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে, তোকে যেন ডাকছে নবীন!…

নবীনের নামটা বিলম্বিত টানে শুধু কাঁপে অন্ধকারে।

সহস্র আশঙ্কা আর উৎকণ্ঠায় এগোয় নবীন ধীরে ধীরে—সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীরাও। পথে দেখা হয় ছোটখাটো আরও কয়েকটি দলের সঙ্গে। তারাও বুঝতে পারে না ব্যাপারটার রহস্য। একে একে গ্রামের সবগুলি পুরুষ এসে জোটে। একটি বিরাট দল ভয়ে ভয়ে এগোয় নবীনের ঘরের দিকে।

জন তিনেক লোক বসে আছে নবীনের দাওয়ায়—আর একজন ডাকছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে নবীন, কে!…

অস্পষ্ট মূর্তিটি বলে, অধর এসেছে।

হঠাৎ!…কেন?…একটা ঢোক গিলে বলে, নবীন কোথায় ?

ওই তো দাওয়ায় বসে।

কি ব্যাপার!

কথা বলে না অধর।

কি হ'ল—বলো না। কথা কইছ না কেন ?

তবু নীরব অধর।

তার পাশ থেকে একজন লোক বলে, তারিণী রইলো না কিছুতেই সেখানে। তাকে পৌঁছে দিতে আসছিলাম সবাই। পথে পড়ে যাই পুলিসের মুখে।

তারপর হঠাৎ থেমে যায় লোকটা—যেমন হঠাৎ কেয়াবনের বাঁক ঘুরে পড়ে' গিয়েছিল একেবারে তাদের মুখোমুখি—আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল কয়েক মুহূর্ত।

শালা ভন্টু হ্যায়—পাকড়ো···

হঠাৎ অন্ধকারে ভাঙা কাঁচের টুকরোর মত ছিটকে পড়ে তারা।

আরে পিয়ারে। ···

অন্ধকারে দ্রুত ধাবমান একটা চিৎকার গ্রামগ্রামান্তর পেরিয়ে ছুটে যায় দিগন্তের দিকে।

আবার সজাগ হ'য়ে ওঠে নবীন—যেমন সজাগ হ'য়ে উঠেছিল তখন। একটা যেন ঝড় বয়ে যায় তার মনের মধ্যে। উঠে দাঁড়ায় সে—অসহায়ের মত চায় সকলের দিকে, অবিনাশবাবুর দিকে। তাদের নিঃশব্দ দু'চোখের গভীর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে পড়ে আবার নবীন।

১৩৫১

মিছে কথা

উদ্‌ভ্রান্ত আকাশ আর অগাধ মাঠের পটভূমিতে হঠাৎ কতকগুলো বড় বড় টিনের চালা আর চিলকোঠা এমন গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায় মনে হয়, বিশাল পৃথিবীটা নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছে একেবারে সেখানে, এতটুকু জায়গা নেই আর। লাল কাঁকরের সড়ক একটা গ্রাম-গ্রামান্তর পেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছে উঁচু উঁচু ঘরগুলো লক্ষ্য ক'রে। ওই সড়ক ধরে দুর্ভিক্ষ-লাঞ্ছিত কুৎসিত নর-নারীর দল—তারাও ছুটে আসছে ঊর্ধ্বশ্বাসে, দিনের পর দিন। ছোট এক-আধটা পোঁটলা, এক-আধটা ভাঙা কড়াই, আর সঙ্গে বিশীর্ণ শিশুর দল। চোখে তাদের আকুল আগ্রহ—আর জিভের তলা ভরতি হয়ে আসে লালায় বার বার। বহুদূর থেকে দেখা যায়: সমৃদ্ধ জনপদ মাথা উঁচু ক'রে আছে।

মফঃস্বল শহর। সড়কের দু-ধারে মাত্র আধ মাইল জায়গা জুড়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু দোকানের পর দোকান; দোকানীর শহর। পাঁতি একজন অফিসার থাকেন—অফিসটা পাশের খোঁয়াড় আর ধানের আড়ত থেকে কোনো রকমে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে সাইন বোর্ডে বড় বড় হরফে পরিচয় দিয়ে। সরকারী রিলিফের কাজ চলে সেখানে—অফিসের সুমুখে গ্রাম-গ্রামান্তরের

ভিড়। তার নাগরিক, তার বেনেতি হট্টগোল আর জনতা—তার ওপর ক্রমবর্ধমান ক্ষুধিত পঙ্গপালের দল—কলেরা, ফেমিন ডিসেণ্ট্রি—মুমূর্ষু আর কুকুরের গোঙানি। আকাশ-ভাঙা বর্ষায় দোকানের চালাগুলোর আনাচ-কানাচ ভরে যায় রাত্রিতে তুর্ভিক্ষলাঞ্ছিত কঙ্কালের দলে। স্বল্প পরিসর স্থানটুকুর মধ্যে জীবন, স্খলন আর ব্যাধি গাঁজলা বেঁধে ওঠে তাড়ির কলসীর মতো। কুকুর আর কাকের টানাটানি থেকে বেওয়ারিশ লাসগুলো ডোমে টেনে নিয়ে যায় ভোরে শহরের বাইরে—শ্মশানে।

শহরের স্বাস্থ্য যাতে সাংক্রামিত না হয় ব্যাধিতে — তার জন্যে রোজই ব্যবস্থা হয়। পুলিস আর নাগরিক-দোকানদারদের তাড়া খেয়ে অন্ধকার বর্ষার মধ্যে ছুটোছুটি করে কঙ্কালের দল—তারপর কোথায় যায় কে জানে! সকালে দোকানগুলোর সুমুখে আবার ভিড় ক'রে এসে দাঁড়ায়। কুৎসিত শিশুগুলো পাখীর মতো মুদি দোকানের সুমুখে রাস্তায় নিঃশব্দে খাদ্যকণা খুঁটে খুঁটে খায়—মেয়েরা বাজারে পচা আলু আর পচা কমলা নেবুর জন্যে বকের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কাঁদে—চিৎকার ক'রে কাঁদে, কচি ছেলেগুলো কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে—মেয়েরা আপনি থেমে যায়। তার পর নিঃশব্দে ছেলের মাথার উকুন বাছে। নাগরিক ব্যস্ততা, পথের জনতা, গরুর গাড়ীর হুঁশিয়ারী, মাঝে মাঝে মোটরের হর্ন, ডোমে টেনে নিয়ে গেল কাকে সুমুখ দিয়ে—কোনোটাই যেন স্পর্শ করে না তাদের।

কিন্তু মোহিনী স্পর্শ ক'রে যায়। নিঃশব্দে তারা জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো পরস্পরের দিকে—আর মনোহর সাহার দোকানের পেছন থেকে মোহিনীকে তুটি ডোম সন্ধ্যের পর শহরের বাইরে বয়ে নিয়ে চলে গেল।

ঝোলার মধ্যে মোহিনী চেয়ে রইলো নিঃশব্দে। মনোহর সাহার কণ্ঠস্বর, বাজারের কোলাহল—তার মধ্যে পরিচিত আরও অনেক কণ্ঠস্বর—সব দূরে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল তুর্বোধ্য গুঞ্জনে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে—কিছুই বুঝতে পারলো না মোহিনী। সমস্ত চেতনা তার

অবসন্ন হ'য়ে আসছে, শরীরের সমস্ত গ্রন্থি, হাত-পা যেন ঠাণ্ডা শক্ত হ'য়ে আসছে।

তার পর এক সময়ে তার সমস্ত সংবিং ফিরে এলো ঘাস আর মাটির ঠাণ্ডা স্পর্শে। চেয়ে দেখলো, অসংখ্য তারায় ভরা কালো আকাশ, আর শ্মশানের উঁচু ঢিপিটায় শ্বেতপাথরের সমাধিমঞ্চ কয়েকটা অন্ধকারে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে।

কাপড়টা নতুন—খুলে নি, কি বলিস্‌ ?

নে। ভালো ক'রে ধুয়ে নিলে হবে।

আমি মরবো না—আমি মরবো না—

কোথায় ফেলে যাচ্ছে তাকে! মোহিনী চিংকার ক'রে উঠলো।

কেউ উত্তর দিল না। অন্ধকার রাত্রি শুধু নিঃশব্দে গভীর হ'য়ে এলো—আর একটা বিশ্রী পচা গন্ধের গুমোট।

কলেরা হয়েছিল মোহিনীর।

তেলে-ভাজার দোকান মনোহরের। রাত্রে কত তেলে-ভাজা খাইয়েছিল মনোহর মোহিনীকে—ঠিক রাখতে পারে নি বুড়ো আদরের মাত্রা!

পাশের দোকানীরা হাসে সকলে, ঠাট্টা করে।

প্রতিবাদে অনেক কি বলে মনোহর, দাঁত নেই—বোঝা যায় না। মনোহরের দোকানের দিকে চেয়ে কুৎসিত কঙ্কাল কতকগুলো রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল—চটে' একটা পোড়া কাঠ নিয়ে মনোহর তাড়া ক'রে গেল তাদের দিকে।

সবাই তাড়া করে।

রাত্রি হ'লো। সেপাইদের তাড়া খেয়ে একে একে তারা অন্ধকারে নিঃশব্দে শহরের বাইরে বেরিয়ে আসে। একটা বট গাছের তলায় জমা হ'লো এসে একে একে। বটের ঝুরি নেমেছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে—তার পর ফাঁকা মাঠ—হু হু ক'রছে অন্ধকারে। ছেলে-মেয়ে আর পোঁটলা-পুঁটলি সামলিয়ে একে একে সবাই শুয়ে পড়লো।

মুখ ফুটে কেউ কিছু বলে না, কিন্তু মোহিনীর কথাই ঘোরা-ফেরা করে ওদের মনে। কবে একদিন এসে মিশে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে—কোন্ গ্রামের একটা মেয়ে, বছর কুড়ি বয়েস। ছেঁড়া ময়লা কাপড়খানির ভেতর থেকে অর্ধাশন আর অনশনেও যৌবনশ্রী উছলে পড়ছে। মুখে সকরুণ ছায়া পড়েছিল একটা। রূপ ছিল মোহিনীর—নিভৃত পল্লীর বহু পুরাতন দীঘির মতো। ব'লেছিল: বিধবা,—দাদার সংসারে নাকি থাকতো। ঘর-দোর, জমি-জায়গা সবই ছিল—তারপর কোথায় নাকি চলে গেল ভাইটা হঠাৎ করে—সে এসে ছিটকে পড়লো তাদের মাঝখানে। সে-ও বেশী দিন নয়। হঠাৎ মোহিনী এক দিন থেকে তাদের দল ছাড়া। তাড়া খেয়ে সকলে যখন বেরিয়ে আসতো শহর থেকে—মোহিনী থেকে যেত। হাসতো মোহিনী। সে তার নিজের গড়া ইতিহাস। কপাল ভালো মোহিনীর। সেই মোহিনীকে শেষকালে শহরের বাইরে ডোমে টেনে নিয়ে গেল—এ তাদের অপ্রত্যাশিত। মোহিনী স্বতন্ত্র, মোহিনী সুন্দর—কি সুন্দর কথাগুলি ছিল মোহিনীর!

··· লুকিয়ে শুয়েছিল মোহিনী অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। দোকান-পাট সব বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। বৃষ্টি পড়ছে টিপি টিপি। ঘুমিয়েও পড়েছিল মোহিনী।

তারপর মুখে হঠাৎ এসে পড়লো টর্চের কড়া আলো।

কে ?

ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো মোহিনী ভারী গলার আওয়াজে। এ শহরে তার গভীর কণ্ঠস্বর সকলে চেনে। তারই সুমুখে ধরা পড়ে কি ব'লবে মোহিনী! এই শহরে সকলের মাঝখানে, সবার থেকে উঁচু আসনটি যার, সে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে মোহিনীর সুমুখে!

কে লো, দারোগা!

মোহিনী হাসে—তাচ্ছিল্যের হাসি:

সায়েব।

অর্থাৎ শংকরের উধ্বর্তন অফিসারবাবু স্বয়ং, দারোগা তার গোমস্তা। তারই স্বমুখে ধরা পড়ে কি ব'লবে মোহিনী! আবার তারই ঘরের বারান্দায় শুয়ে সে। জলের ছিচ কেটে বারান্দার মেঝে জলে থই থই ক'রছে। পরনের কাপড় একখানি সম্বল—তাও ভিজে গিয়েছে। টর্চটা আপাদমস্তক বারকয়েক ঘুরে গেল মোহিনীর ওপরে নিঃশব্দে।

মোহিনী ব'ললো, চলে যেতে ব'লবেন জানি—কিন্তু এই জলে যাবো কোথায় বলে দিন।

এঁ্যা, এই কথা ব'লঙ্গি তুই! মতি শুধু অবাক হয়।

কেন ব'লবে না মোহিনী? ওদের গরম ঘর আর নরম বিছানা, ওদের পেটভরা ঘুম আর কত রকমের পোশাক—বর্ষার অন্ধকার আকাশের তলে কারা ঘুরে বেড়ায়—ঘর নেই, মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই একটু, তাদের খবর কি জানে?

ঠিক কথা, তারপর?

সায়েব শুধু হাসলো—ব'ললো, না, চলে যেতে ব'লবো না। ভেতরে এসো, কাপড় যে ভিজে একেবারে সপ্‌ সপ্‌ ক'রছে! শুকনো কাপড় দিচ্ছি।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ব্যবহার। মোহিনীর বুকের মধ্যে কথাগুলো তোলপাড় করে। সহস্র দুঃখকষ্টের মাঝখানে যার অবিচার আর নিষ্ঠুরতার জন্যে গাল পেড়েছে মোহিনী কতদিন বর্ষার আকাশ মাথায় ক'রে—তারই স্বমুখে দাঁড়িয়ে তার অন্তরভেদী মিষ্টি কথার বন্যায় কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাকে। মোহিনী জড়সড় হ'য়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলো।

ভেতরে এসো। ভিজে কাপড়টা ছেড়ে ফেল, অসুখ ক'রবে।

··· হায় রে! আমার আবার অসুখ! কত দিন কত রাত কেটে গিয়েছে এমনি জল-বৃষ্টি মাথায় ক'রে। চোখে হঠাৎ জল উপচে আসে মোহিনীর। এই রকম ধরনের কথা, তার ভাব আর ভঙ্গি, কণ্ঠস্বরটি পর্যন্ত—সব যেন কতদিন-কার জানা আর শোনা বলে মনে হয়। সন্দেহ নেই—নেই কোন ভয় আর

ভাবনা। মোহিনী মাথাটি নিচু ক'রে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। পরনের ভিজে কাপড়টি ছেড়ে শুকনো কাপড়খানি পরলো।

ঘরের মধ্যে টেবিলের ওপরে টিম্ টিম ক'রে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। অগোছাল ঘর। ফরসা কাপড় আর ময়লা কাপড় তালগোল পাকিয়ে জড়ো হয়ে আছে, এক রাশ কাগজপত্র বিছানা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে আছে—চেয়ার-টেবিল-বাক্স—সে এক লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। মোহিনী দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে রইলো। সায়েব চেয়ে আছে তার দিকে—কি দেখছে এক দৃষ্টিতে—কি জানি!

তোমার নাম কি? হঠাৎ এক সময়ে জিজ্ঞেস ক'রলো।

মোহিনী।

তোমাদের ঘর কোন্ গ্রামে মোহিনী?

গ্রামের নাম ব'ললো মোহিনী। এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ দূর শুনে ব'ললো, অতো দূর থেকে তুমি এসেছ? একা?

আর কে আছে যে সঙ্গে আসবে মোহিনীর?

একটি একটি ক'রে অনেক কথা জিজ্ঞেস কর'লো মোহিনীকে। সব শুনে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লো। ব'ললো, আজ সারাদিন নিশ্চয়ই কিছু খাওয়া হয় নি?

মোহিনী চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

বুঝেছি। কিন্তু এত রাত্রে! থামো, বিস্কুট আছে বটে।

বিস্কুটের টিন খুললো সায়েব।

এই লোকটার পায়ে লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে মোহিনীর।

ও থাক।

কেন, খাবে না? লজ্জা ক'রো না মোহিনী।

আপনি খাবেন, ও থাক। আমার খিদে নেই।

বড়লোকের খাওয়া ব'লে মনে মনে গাল দিচ্ছ মোহিনী—বুঝতে পারছি। কিন্তু কি তোমাকে খেতে দিই!

এই অদ্ভুত লোকটির আগ্রহ, দাক্ষিণ্য আর আচরণে মোহিনীর চোখ বার বার যেন জলে ঝাপসা হয়ে আসে। পেটভরে দুটি খেতে দেওয়ার কিছু নেই ব'লে আজ একজন কি ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে—আর কত দিন কেটে গিয়েছে মোহিনীর, পেটে কিছুই পড়ে নি। ক্ষুধা-তৃষ্ণা কোথায় চলে গিয়েছে মোহিনীর—শুধু ওই কথায়। কত কথা বলে সায়েব :

প্রথমে তোমাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম, রিলিফ নিতে এসে দল ছাড়া হ'য়ে হয়তো রয়ে গিয়েছ। তোমাকে দেখে আর তোমার সব কথা শুনে বিশ্বাস হয় না কিছুই মোহিনী, তুমি ছেঁড়া ময়লা কাপড়খানি পরে পথেই ঘোরো বা যেখানেই যাও। বিধাতা তোমাকে এত রূপ দিয়েছেন, গুণ দিয়েছেন—আর এত দুঃখও দিয়েছেন !···

মোহিনী সুখী হতে পারতো—সুখী ক'রতে পারতো কারুকে। কেন পারতো না ?

মোহিনী শুধু নিঃশব্দে শুনে যায়।

তুমি শুয়ে পড়ো মোহিনী—রাত্রি হ'লো। ব'লে তারপর হঠাৎ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে—কোথায় গেল কি জানি ? আড়ষ্টতা কাটে না মোহিনীর। একপাশে পরিষ্কার ধপ্‌ধপে বিছানা পাতা খাটের ওপরে। মেঝেতেই শুয়ে পড়লো সে—আর চোখে ঘুম নেমে এল কখন।

মেঝেতেই শুয়ে রইলি ? সায়েব বুঝি খাটে শুল ! কাত্যায়নীর ফিকে হাসিতে কৌতুক।

যার কথা ব'লছি—সে ছোটলোক নয়। সে মানুষও নয়—দেবতা। তার কি জানিস তোরা ?

কাত্তির যতো বাজে কথা। বাদ দে মোহিনী, তারপর ?

তারপর মোহিনীর ঘুম ভাঙলো শেষ রাত্রের দিকে। ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো সে। লণ্ঠনটা তেমনি জ্বল্‌ছে। ঘরে কেউ নেই। ঘরের মালিক যে কোথায়—জানা নেই। ভাবছে বসে বসে—এবারে কেমন ক'রে বাইরে

যাওয়া যায়!—এমন সময় ঘরের মালিক এসে হাজির। ব'ললো, যাওয়ার জন্যে ছট্‌ফট ক'রছিলে বোধ হয়?

আমি যাই এবার, রাত বোধ করি শেষ হ'য়ে এল।

কিন্তু যাবে তুমি কোথায়! এই বাজারের কোথাও—অথবা কোনো গাছতলায় তো?

সবই তো শুনেছে মোহিনীর কাছ থেকে—কি আর ব'লবে মোহিনী?

মোহিনী ব'ললো, ভোর হ'য়ে এল বোধ হয়—আমি যাই।

লোকে কি ব'লবে—না?

তারা হাসবে—ব'লবে: কোথাকার কে একটা মেয়েমানুষ রাত্রে ছিল তার ঘরে। এতে মোহিনীর চেয়ে সে-ই বেশী ছোট হ'য়ে যাবে—যে ব'সে আছে সকলের সম্ভ্রম আর সম্মানের সিংহাসনে। মোহিনীর কপালের কালিতে ম্লান হবে সে-ই। প্রাণ থাকতেও তা পারবে না মোহিনী। এই একদিনের কথা চিরকাল মনে থাকবে মোহিনীর।

কিন্তু কাল একবার এসো মোহিনী। ভেবে দেখি—তোমার জন্যে কি ক'রতে পারি। আসবে তো কাল—ব'লে যাও।

মিনতিভরা কণ্ঠস্বর। বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে মোহিনীর, হঠাৎ যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে। কোনো রকমে একটা প্রণাম ক'রে বাইরে বেরিয়ে এলো সে, বাইরে এসে চোখের জল মুছলো।

তারপর সারাদিন ভেবে মরে মোহিনী: কখন যাবে সে! সময় তো বলে নি। দিনের বেলা পাঁচ জনের সুমুখে গেলে লোকে ব'লবে কি? কিন্তু যাওয়া না হয় হ'লো—তারপর? একটা কথার উত্তর কোনো রকমে খুঁজে পায় না মোহিনী। কত হাজার হাজার লোক তো আছে—তাদের সকলকেই কি এমনি ক'রে বলে সেই লোকটি—না, শুধু তাকেই ব'লেছে!

শুধু তোকেই ব'লেছে লো—তোকেই ব'লেছে। আমাদের জুতো মেরে

তাড়িয়ে দেবে—দেখিস্ না রোজ। মতি রোরুদ্যমান ছেলেটার মুখে স্তনের বোঁটাটা ভরে দিয়ে ব'ললো, তার পর ?

তার পর দিন রাত্রিতে গেল মোহিনী—দোকান-পাট তখন সব বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। সব আলো নিভে গিয়েছে—শুধু একটি আলো জ্বলছে তখনও একটি লোকের ঘরে। আর সে লোকটি পায়চারী ক'রছে অন্ধকার বারান্দায়। দূর থেকে দেখতে পেল মোহিনী!

কাছে যেতে চিনতে পেরে ব'ললো, এসেছ মোহিনী—ভেতরে এসো। তোমার জন্যে এখনও পর্যন্ত খাওয়া হয় নি আমার।

তার জন্যে না খেয়ে ব'সে আছে লোকটি! ঠাকুর-চাকরদের বিদায় দিয়ে দিয়েছে। সে কে—কেন তার জন্যে এতো ? পথের কাঙাল—দিনের পর দিন কেটে যায় যার অনশনে ? কথাগুলো যেন তীরের মতো বুকে গিয়ে বেঁধে।

ব'ললো, বড্ড খিদে পেয়েছে মোহিনী—আমাকে খেতে দাও। হেসে ব'ললো, সব আবার দিয়ে ফেলো না—আজকের রাত্রিও তাহ'লে তোমার না খেয়ে কাটবে।

কিন্তু মোহিনীর হাতে খাবে সে! মোহিনী ব'ললো, আমার হাতে খাবেন আপনি ?

কেন খাবো না! শুধু আমি নই—তুমি দিলে সকলেই খুশি হ'য়ে খাবে মোহিনী।

আরও কতো কথা বলে—কথাগুলি বুকের মধ্যে, মনের মধ্যে যেন দাগ কেটে কেটে বসে। বদ্‌লির দরখাস্ত ক'রবে সে—কাল সারাদিন ভেবে ভেবে ঠিক ক'রেছে। যাওয়ার সময় এখান থেকে নিয়ে যাবে মোহিনীকে। যাবে তো মোহিনী তার সঙ্গে ?

যাবে না কেন মোহিনী ?

মোহিনী ব'ললো, আপনার সংসারে দাসী-চাকরানীর কাজ ক'রে দু বেলা দু-মুঠো যদি খেতে পাই শুধু—সেই আমার পরম ভাগ্য।

দাসী-চাকরানীর কথা তো আমি ভাবছি না মোহিনী—তাদের পয়সা দিয়ে পাওয়া যায়। কিন্তু পয়সা দিয়ে তোমাকে পাওয়া যাবে না—সে আমি ভালো ক'রে বুঝেছি। কাল তোমার যাওয়ার পর থেকে অনেক ভেবেছি আমি। বার বার শুধু মনে হ'লো, বিধাতাই হোক, আর যেই হোক, যথেষ্ট অবিচার ক'রেছে তোমার ওপরে। কেন তোমার ঘর থাকবে না—কেন থাকবে না সংসার? কেন তুমি সুখী হবে না—আর একজনকেই বা সুখী করতে পারবে না কেন? চলো মোহিনী আমার সঙ্গে—এখানে নয়, অন্য কোথাও—যেখানে সুখ, শান্তি—কিছুরই অভাব থাকবে না আমাদের।

মোহিনীর চোখে জল।

ও কি, কাঁদছো মোহিনী?

লুকিয়ে চোখের জল ফেলে আনন্দ নেই। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে ভালো লাগে মোহিনীর। এত সুন্দর সুন্দর কথা—সে এক অন্য জীবনের কথা—শোনে নি কখনও মোহিনী। শুধু একজন শোনালো। আবার সে-ই একজন—যে এখানকার সবার উঁচু আসনটিতে ব'সে আছে। যার খ্যাতি সম্মান—যার ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির তুলনা নেই। মোহিনীর সব স্বপ্ন, আশা, দুরাশা, স্বর্গ-নরক সত্যি-মিথ্যেতে সব যেন একাকার হ'য়ে যায়। অত ভাগ্য কি তার সইবে? অপ্রত্যাশিতভাবে তার জীবনে কোথা দিয়ে যেন কি হ'য়ে গেল।

হবে না? তোর রূপটা কি সোজা লো? মতি ব'ললো, ভালো কাপড় চোপড় পরলে কে ব'লবে যে, এই মোহিনী না খেয়ে-দেয়ে একদিন গাছতলায় শুয়ে দিন কাটিয়েছে? তার পর?

তারপর শেষ রাত্রিতে চলে আসার সময় ব'ললো, তোমাকে যেতে দিতে ইচ্ছে নেই মোহিনী—কিন্তু এখানে লোকের মুখ আটকাতে পারবো না। তারা তোমাকে ছোট ক'রে দেখবে।

তাই বুঝি সারা দিন বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াস?

কি করি!

দাগ

লক্ গেটের পাশ ঘেঁষে ছোট ছোট তাঁবু পড়লো কয়েকটি। ছোট সেনাদল একটি হঠাৎ হাজির হ'লো এসে একদিন। বেঁটে খাটো কালো কালো লোকগুলি —খরগোসের মতো মুখ। ছোট ছোট তীব্র অনুসন্ধানী চোখে যতো দূর চায় তারা, নদীতীর থেকে দিগন্তসীমা পর্যন্ত শস্যশূন্য মাঠের পর মাঠ ধূ ধূ ক'রছে পরিত্যক্ত প্রান্তরের মতো। সজীবতার এতটুকু রং নেই কোথাও। সাইক্লোন আর প্লাবনের নির্মম চিহ্নগুলি পড়ে আছে এখানে ওখানে। বানভাসি বিপুল-কায় মহাজনি নৌকোগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে উঁচু ডাঙার ওপরে আর যেখানে সেখানে মানব-অঙ্গের রকমারি হাড়ের ছড়াছড়ি। ক্যানেলের মুখে জেলে পাড়ার দেয়ালগুলোর কিছু কিছু চিহ্ন এখনও আছে। গ্রামগুলি অনেক দূরে দূরে—অনেক দূরে ঝুঁকে-পড়া আকাশের গায় নিষ্প্রভ তামাটে বনরেখা। ক্যানেলের পাড়ে দল বেঁধে হল্লা করে সৈনিকেরা—জল্পনা-কল্পনা করে গ্রামে যাওয়ার। নারীস্পর্শহীন রুক্ষ শূন্যতা ভালো লাগে না ওদের।

লক্ গেটের পাশেই টোলবাবুর বাংলা। ছেলে-মেয়েদের তিনি সরিয়ে দিয়েছেন ওদের আসবার খবর শুনেই। তার পর একদিন তিনি ছুটলেন গ্রামের দিকে অসংখ্য খবরের বোঝা নিয়ে।

তারা এসেছে : যুদ্ধ সন্নিকট। কোত্থেকে একটা মেয়েমানুষও জুটেছে এসে।···

গ্রামপ্রান্তের শান্ত মন্থর জীবন। টোলবাবুর খবরে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল নিঃশব্দ পুঞ্জীত ঝরাপাতার বনে।

অতিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো গ্রামের বিত্তবানেরা : স্ত্রী-কন্যা, সম্ভ্রম-ইজ্জত, সমাজ! ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায় সকলের।

কিন্তু তারা ভয় পায় না। প্রথম আগন্তুক কুমুদ, কিন্তু শুধু সে একাই নয়। ক্ষুধা পীড়িত, অর্ধনগ্ন স্ত্রীলোকগুলি একে একে এসে ভিড় করে তাঁবুর আশে-পাশে। সেই সব বয়সের মেয়েরা—যারা দাগ কাটে না—রং টানে প্রবাসী সৈনিকদের মনে। ছিন্ন মলিন বাস, রুক্ষ কেশ, বিশীর্ণ কুৎসিত—তবু তারা স্ত্রীলোক।

খাওয়ার কথা শুনে একটা বছর দশেকের ছেলেও জুটেছে এসে। ব্যর্থ আক্রোশে কুৎসিত ভাবে গালাগালি করে : সব জানে—সব দেখেছে সে, কি করে বাতাসী রাখালীরা অন্ধকার মাঠে।

মেয়েরা হাসে, ধমকায়—আর সৈনিকদের দেওয়া সেঁকা রুটি খায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে।

বাতাসী কুমুদকে দেখিয়ে চোখ টিপে ব'ললো, ষাঁড়ের মত চেঁচাস্ কেন ছোঁড়া —যা না ওই ওর কাছে। দেখছিস্ না—ওর কতো!

সে কুমুদ।

বয়স অল্প তার, গালের হাড় দুটো উঁচু হ'য়ে ওঠে নি এখনও, এখনও তার মুখে লাবণ্য আছে যৌবনের, পালিস্ আছে তার মসৃণ যৌবনপুষ্ট দেহে।

ছেলেটা তার সুমুখে এসে দাঁড়ালো।

কুমুদ কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রুটি একখানা হাতে গুঁজে দিল তার। তার পর সেখান থেকে চলে এলো সে। বড় মহাজনি নৌকো একটা উপুড় হ'য়ে ভেঙে পড়ে আছে মাঠের এক প্রান্তে। নিঃশব্দে সেখানে এসে ঢুকলো কুমুদ অন্ধকারে। খড়ের ওপরে চট পাতা আছে এক পাশে।

সেই তার ঘর-সংসার। অন্ধকারে এক কোণে বসে বসে সে খেতে লাগলো রুটিগুলি।

বানভাসি বেওয়ারিশ ভাঙা নৌকো—জলে সে আর ভাসবে না। 'শস্যশূন্য মাঠের প্রান্তে শেষ কূল তার শক্ত নোঙরের সঙ্গে চিরদিনের জন্য বাঁধা। কুমুদ নিশ্চিন্তে আছে তার মধ্যে। পেট ভরে খাওয়া, আর তলপেটের কাপড়ের তলায় একটি একটি ক'রে এক টাকার নোট অত্যন্ত সযত্নে জমা হ'তে থাকা দিনের পর দিন। সেই ছেলেটা রোজ ঘোরে কুমুদের আশে-পাশে।

রোদে ঘাসবন পোড়ে—আবার গজায়।

নিরলস দিনের মুহূর্তগুলির ফাঁকে ফাঁকে অতীত উঁকিঝুঁকি মারে কুমুদের মনে। একটি ম্লানমুখ ক্ষুধাতুর শিশু তীব্র দৃষ্টিতে কঠোর তিরস্কারে যেন চেয়ে আছে তার দিকে। একটা অপরাধের চেতনা অনুক্ষণ বিঁধতে থাকে তাকে।

একদিন সকালে বেরিয়ে পড়লো কুমুদ গঞ্জের বাজারের দিকে। ঘুমন্ত ছেলেটাকে সেখানে ছেড়ে পালিয়েছিল একদিন কুমুদ। ছেলের সন্ধান পেল না কুমুদ—সন্ধান পেল সে স্বামীর, যে তাকে ছেড়ে পালিয়েছিল একদিন।

বাজারের এক কোণে দাঁড়িয়েছিল মহেশ। হঠাৎ কুমুদকে দেখতে পেয়ে গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা ক'রলো।

পেছন থেকে ডাক্‌লো কুমুদ, শুনছো—

উপায় নেই। নিতান্ত অনিচ্ছায় ঘুরে দাঁড়ালো মহেশ—তার শীর্ণ কদাকার চেহারাটাকে আরও কদাকার ক'রে, একটা স্ত্রীলোক যাতে ভয় পায়, একটা স্ত্রীলোক যাতে কোনো অধিকারের দাবী জানাতে সাহস না পায়।

কুমুদ তাড়াতাড়ি তার মুখের দিকে চেয়ে ব'ললো, খাবে?

হঠাৎ সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো মহেশের। সাগ্রহে ব'ললো, কোথায় কুমুদ?

এসো আমার সঙ্গে।

জিভে জল আসে মহেশের।

মহেশকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলো কুমুদ লক্-গেটের পাশে। রাত্রির অন্ধকার তখন নিঃশব্দে ঘন হ'য়ে এসেছে। সৈনিকেরা আগুন জেলে রুটি সেঁকছে তাঁবুর বাইরে। মহেশকে বসিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হ'য়ে গেল কুমুদ। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলো রুটি নিয়ে।

পরম আনন্দে রুটিগুলো দাঁতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গোগ্রাসে গিলতে লাগলো মহেশ। কুমুদ অন্ধকারে বসে রইলো চুপ ক'রে। অপেক্ষা করে—প্রত্যেকটি মুহূর্তে, এই হয় তো মহেশ জিজ্ঞেস্ ক'রবে, ভূতো কোথায়—ভূতো, তাকে দেখছিনে যে!

কেমন যেন ভয় করে কুমুদের। হারানো গৃহকোণের শাসন-ভীরু মন যেন ফিরে আসে কুমুদের মধ্যে।

মহেশ নিঃশব্দে এক মনে খেয়ে চললো। ভূতো ব'লে কেউ ছিল—আজ নেই, একথা যেন মনেই পড়ে না মহেশের।

নিজেই শেষকালে কথাটা পাড়ে কুমুদ:

ভূতোকে দেখতে পাও?

ব'লেই সে ভয়ে ভয়ে চেয়ে রইলো মহেশের দিকে। কি ব'লবে মহেশ!

কিন্তু নাঃ, মহেশ শুধু খাওয়ার ফাঁকে ব'ললো, দেখিনি তো। খুঁজে দেখবো।

যেন সব জানে মহেশ। অথচ ওটা যেন এমন কিছু নয়—এমনিই ভাব তার।

কুমুদ সাগ্রহে ব'ললো, যাবে একবার খুঁজতে? পাঁচখালির গঞ্জের হাটে থাকতে পারে। মনটা যেন হঠাৎ হাল্কা হ'য়ে গেল কুমুদের—যেন ভূতোকে পাওয়া গিয়েছে। ব'ললো, কালই যাও না একবার!

যাবো, কালই যাবো।

হি হি ক'রে মহেশ হাসলো। ব'ললো, আর রুটি নাই কুমুদ?

আর তো নাই।...

কুমুদের মনের ওপর থেকে একটা গুরুভার সরে যায় আস্তে আস্তে। ভূতো যেন চিরকালই তার সঙ্গে সঙ্গে আছে।

পরের দিন সারা বেলা সে অপেক্ষো ক'রে চেয়ে রইলো পথের দিকে। জীবনের সহস্র আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, কামনা আবার যেন ফিরে ফিরে আসে। তার স্বামী খুঁজতে গিয়েছে পরিত্যক্ত ছেলেটাকে। ভূতোকে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। জীবনের সমস্ত অপরাধ তার মুছে নিঃশেষ হয়ে যাবে—মস্ত বড় একটা অপরাধ। পুরানো দিনের আমেজ লাগে মনে।

মহেশ কিন্তু ফিরে এসে ব'ললো, পেলাম না।

পেলে না! কুমুদের মন যেন হাজার টুক্‌রোয় গুঁড়িয়ে গেল।

আবার যাবো। বাচ্চা ছেলে—কত দূরেই বা আর যাবে। হি হি ক'রে হাসলো মহেশ। তারপর ব'ললো, তুই ভাবিস্ নি কুমুদ। ভূতোকে ঠিক এনে দেবো। আরও একটু ঘুরে দেখতাম—তা বড্ড খিদে পেল, তাই চলে এলাম। রুটি নাই কুমুদ আর?

মহেশের আশ্বাসে খুশি হয় কুমুদ। ব'ললো, ভাত রেঁধে দেবো। তুমি ভাত-টাত খেয়ে আবার একবার যাও খুঁজতে।

রান্নার আয়োজন ক'রতে লাগলো কুমুদ সেই ভাঙা নৌকোর এক পাশে। কেমন যেন নেশা লাগে তার সংসারের হারানো পরিবেশ একটা গড়ে তুলতে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে বাতাসী, রাখলী—ওরা সবাই সকৌতূহলে এলো সেই দিকে।

রাধা ব'ললো, কি লো—রাঁধবি নাকি!

হাসলো কুমুদ—ভারি পরিতৃপ্তির হাসি: দেখুক ওরা।

মহেশকে দেখিয়ে ব'ললো, না হ'লে খাবে কি?

মহেশ যেন বিগলিত হ'য়ে হাসে হি হি ক'রে।

বাতাসী, রাখালী, রাধা অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে কুমুদের দিকে। কুমুদের ভালো লাগে। বাতাসের ঝাপটায় ধোঁয়া এসে লাগে চোখে, যতদূর চোখ যায় —তার মধ্যে একটু ভালো জলের চিহ্ন নেই, ভালো উনুন নেই—এমনি ছোট ছোট কত অসুবিধের কথা বলে কুমুদ। সে যেন একটি পরিপূর্ণ সংসার

পেতে বসেছে তিনটে ইটের ওপরে একটা মাটির হাঁড়ি চাপিয়ে। তার উচ্ছ্বসিত মনের কোথাও একটু অভাব নেই।

দুর্ভিক্ষ কোথায়! অভাব কি তার!

শুধু ভূতো। তাকে পাওয়া যাবেই।

খাওয়ার শেষে মহেশ ভূতোকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। কিছুদূর এসে একটা হাট-চালা আশ্রয় ক'রে পরম আলস্যে শুয়ে পড়লো সে। তারপর ঘুম নেমে এলো তার চোখে। কুমুদের ঘর-সংসার, কুমুদ, ভূতো—সবগুলো একটা অচেতন গাঢ় অন্ধকারে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

তারপর সন্ধ্যের মুখোমুখি কুমুদের সঙ্গে দেখা ক'রে ব'ললো, খুঁজে পেলাম না কুমুদ। দেখি কাল যাবো আবার। বড্ড খিদে পাচ্ছে—রুটি-টুটি আছে নাকি?

ব'লে সেই রকম হি হি ক'রে হাসে মহেশ।

কুমুদ নীরবে অদৃশ্য হ'য়ে গেল অন্ধকারে। সমস্ত মন তার ভেঙে পড়ে। সারা দিনের গড়ে তোলা নানান্ স্বপ্ন—নানান্ রং, অপরিমেয় পরিতৃপ্তি আর শান্তি সব যেন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়।

মহেশের খোঁজার শেষ নেই, শেষ কালে একদিন ভূতোকে খুঁজে নিয়ে এলো বাতাসী। শীর্ণ কঙ্কালসার ভূতো। যেন একটা চামড়ার থলের মধ্যে অবরুদ্ধ জীবন একটা ধুঁকছে।

সেই কদাকার শিশুটাকে কোলে ক'রে কুমুদ আদর করে—চুমু খায়। তার পর কি ক'রবে সে ভেবে পায় না।

হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচলো কুমুদ।

মহেশ ব'ললো, আহা—রুটি-টুটি থাকে তো দে কুমুদ ওকে।

কুমুদ হেসে ব'ললো, ওকে দিই—আর তুমি ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে চম্পট দাও আবার।

সে পুরানো কথা। মহেশ এই ভাবেই পালিয়েছিল একদিন।

মহেশ হি হি ক'রে হেসে উঠলো। ব'ললো, পেটের জ্বালায় পালিয়েছিলাম কুমুদ। তোকে ছেড়ে আর যাই।

আহা! ছেড়ে পালাবে না, কিন্তু পালিয়েছিলে কেন?

চোখে বিদ্যুৎ—সমস্ত দেহে যেন হাসির উল্লাস। স্বামী ফিরে এসেছে, ছেলে ফিরে এসেছে—পরিতৃপ্ত জীবন। বাতাসের ঝাপটায় গায়ের কাপড়টা উড়ে উড়ে পড়ে কুমুদের—সেটা আর ইচ্ছে ক'রেই গায়ে টেনে তোলে না সে। তার নগ্নবক্ষের পরিপূর্ণতা, তার চাপা হাসির উল্লাস—তার গভীর কালো চোখের ঝলক—সে আর এক কুমুদ।

বাতাসী, রাখালী—ওরা হাঁ ক'রে চেয়ে আছে তার দিকে। দেখুক তারা।

অন্ধকারের চারা গাছ যেমন ক'রে আলোর দিকে উঁকি মেরে আকাশকে আর বাতাসকে অভিনন্দন জানায়—আর পরম উল্লাসে নিজেকে পল্লবিত ক'রে তোলে—কুমুদ তেমনি ক'রে মিলে ধরলো নিজেকে।

ক্যানেলের মুখে জেলেপাড়ার উঁচু ঢিপিটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সহস্র চিন্তায় দোল খায় কুমুদ। খালের ধারে সেই বড় অর্জুনগাছটা—যেটায় তাদের ডিঙিটা বাঁধা থাকতো, সেটা ভেঙে পড়েছে ঝড়ে। কত ছেলেমেয়ে বানের জলে ভেসে গিয়ে মরেছে—তাদের মুখগুলো মনে পড়ে। যারা বেঁচেছিল—তাদের মধ্যে পুরুষেরা কে কোথায় পালিয়েছে। মেয়েদের মধ্যে সে, বাতাসী আর রাধা ছাড়া আর কেউ নেই। ওইখানে তারা হাসতো একদিন, ওইখানে ছিল তার প্রথম ঘর-সংসার, ওখানেই তার ছেলে হ'য়েছে। সুখ-দুঃখের সে এক অতীত জীবন সহস্র রঙ নিয়ে ফিরে আসে। স্বামী ফিরে এসেছে, ছেলে ফিরেছে। আর তার অভাব কি! এবার একটি ঘর চাই, একটি নৌকো চাই, একটি জাল চাই। তারপর আবার সেই জীবন।

কুমুদ উৎসাহিত হ'য়ে ব'ললো মহেশকে, এই রকম ক'রে আর কতোদিন চলবে! ঘরটর একটু তুলবে না?

মহেশের মুখ শুকিয়ে গেল।

কুমুদ ব'ললো, বুঝতে পারলে না না-কি কথাটা!

খড় কোথায় পাবো কুমুদ—টাকা কোথায়!

একটু টঙের মতো ঘর হবে—কতো টাকাই বা আর লাগবে। আমি দেবো।

দেয়াল দিতে হবে।

আমি মাটি এনে দেবো।

নতুন জীবনের উল্লাস কুমুদের—কোনো বাধাই যেন সে মানবে না।

বর্ষা নামলে থাকবে কোথায়—সে খেয়াল আছে!

মহেশ নীরব।

এমন কুঁড়ে হ'য়েছ আজকাল তুমি। আগে তো এরকম ছিলে না! খড় কোথায় পাওয়া যায়, চেষ্টা ক'রে ত্যাখো তুমি।

একটা উত্তেজনা আর চাঞ্চল্যের ভেতর দিয়ে দুটো দিন যেন ঝ'ড়ো হাওয়ার মত কেটে গেল কুমুদের। বাতাসী, রাধা—ওরা সবাই জেনে গেল, ঘর উঠবে কুমুদের। ছোট একটু টঙের মত—তা হ'লেও সেটা ঘর। সেখানে মন আছে, সেখানে জীবন আছে—কুমুদের গোটা জীবনটা। কতোই বা বয়স হ'লো তার!

কিন্তু মহেশ অচঞ্চল—সে যেন মরে গিয়েছে।

কুমুদ বিরক্ত হ'য়ে উঠলো। ব'ললো, খড়ের খোঁজ পেলে?

খুঁজছি তো। মহেশ হঠাৎ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে।

কোথায় খুঁজছো! দুটি দুটি খাচ্ছো আর ওই টৌলবাবুর তাড়া খেয়ে খেয়ে সেইখানেই তো পড়ে আছো। না না—তুমি যাও, এক্ষুনি যাও।

একটা স্বতঃস্ফূর্ত জীবনবেগ লাফ দিয়ে ওঠে যেন কুমুদের মন থেকে—ছুটে যাবে সে কাল হ'তে কালে, তার জীবন থেকে তার ছেলের জীবনে, সুদূর ভবিষ্যতে, সমস্ত বাধা-বন্ধন অতিক্রম ক'রে।

আবার সেই নিরলস জীবন—স্পন্দনহীন।

তারপর হঠাৎ একদিন চাঞ্চল্য আসে।

রাখালী উত্তেজিত হ'য়ে বলে, কোথায় যাবে ওরা? কাল যাবে শুনছি!

সেনা-শিবির উঠে যাবে। বর্ষা নেমেছে।

রাধা সাগ্রহে জিজ্ঞেস্ ক'রলো, অনেক দূরে যাবে না-কি?

কুমুদ নিঃশব্দে শোনে। কিছুই বলে না। মনে মনে বলেঃ ওরা চলে যাবে—ওরা চলে যাবে তবে! তার পর! ···

সকালে ঘুম থেকে উঠে নৌকোর বাইরে বেরিয়ে এলো ভূতো। লক্ গেটের পাশ থেকে উঠে গিয়েছে শিবিরগুলি। তার পর ভূতো হঠাৎ চিৎকার ক'রে উঠলো।

কুমুদ বেরিয়ে এলো বাইরে। মনে মনে ব'ললো, তাঁবুগুলো নেই। কেমন একটা স্বস্তি ফিরে আসে যেন মনে।

কি হ'লো! কুমুদ বিরক্ত হ'য়ে বলে, চেঁচাচ্ছিস্ কেন?

চেঁচাবো না! আরও চেঁচাবো। আমার ঘর কে ভেঙে দিয়েছে ছাখো না। এই ছাখো—এই পায়ের দাগ, ওই দাগ—ওই দাগ—

সেই ছেলেটা হাসছে দূরে দাঁড়িয়ে যে কুমুদের কাছে রুটি চেয়ে চেয়ে খেত।

ভারি বুটের অসংখ্য দাগের পর দাগ—সুগভীর শেষ দাগগুলি। বর্ষা ভেজা নরম মাটিতে কেটে কেটে ব'সেছে। কুমুদ নীরবে চেয়ে রইলো সেই দিকে। তার ইচ্ছে হয়, দু-হাতে ওই দাগ মুছতে মুছতে ছুটে যাবে সে পাগলের মতো ওই শস্যশূন্য প্রান্তর পেরিয়ে, গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে—যত দূর গিয়েছে তারা।

চোখ ফেটে যেন জল বেরিয়ে আসেঃ ও দাগ কি মুছবে না! ভূতোর অভিযোগ-উদ্যত মুখের দিকে যেন চাওয়া যায় না।

১৩৫১

কুকুর

রাত শেষ হ'য়ে এসেছে—তবু অন্ধকার কাটে নি। শেষ বর্ষার ছেঁড়া টুকরো —মেঘে অন্ধকার ঘন হ'য়ে আছে আকাশে। সেই ক্ষান্তবর্ষণ অন্ধকারে মহকুমার সদর থানা থেকে বেরিয়ে এল গুটিকয়েক অস্পষ্ট মূর্তি নিঃশব্দে—ঘাড়ে বন্দুক।

ইসমাইল আসছিল আগে আগে। কয়েক পা এসে হুড়মুড় ক'রে হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাটিতে।

হুঁশিয়ার।···

বিশ্রী গালাগালি দিয়ে ইসমাইল উঠে দাঁড়ালো।

পেছন থেকে টর্চের আলো এসে পড়েছে তিন জনের। কয়েকটা কুকুর সরে গেল আলো থেকে অন্ধকারে। স্ত্রীলোকের আধখাওয়া মৃতদেহ একটা পড়ে আছে ইসমাইলের পায়ের কাছে। তিনটে টর্চের আলো ঝল্‌কে ওঠে তার ওপরে। সেই আলোয় চিনতে পারে সকলে : বোবা বুড়ীটা মরেছে এত দিনে —থানার সুমুখে নিঃশব্দে বসে থাকতো যে রাস্তার পাশে—আর মাঝে মাঝে চেঁচাত দুর্বোধ্য ভাষায়।

মাগী মরেছে এইখেনে এসে। ক্রুদ্ধ ইসমাইল বুটের ঠোক্করে সরিয়ে দিল সেটাকে রাস্তার ওপর থেকে।

তারপর আবার চলতে শুরু ক'রলো ওরা।

পেছন থেকে একজন ঠাট্টা করে ইসমাইলকে: থানা থেকে বেরিয়েই মাটি নিল ইসমাইল—তাই বোধ হয় ভেবে-চিন্তে দূরে কোথাও আর পাঠানো হ'লো না তাকে। ···

সকলকে এবার মাটি নিতে হবে। বিকৃত কটু কণ্ঠে বলে ইসমাইল, মেয়ে-ছেলেরা মরছে এখেনে—ওদিকে কিন্তু তাল ঠুকছে মরদেরা গাঁয়ে গাঁয়ে। ধান নেই—চাল নেই, বারুদ হ'য়ে আছে সব, ক্ষেপে ছুটে আসবে যেদিন—দেখবি। মনে পড়ে আর বছরের কথা—ঠিক এমনি দিনে?

ইসমাইলের কথার জবাব দেয় না কেউ। নিঃশব্দে ওরা এগিয়ে চলে, আর মনে পড়ে সকলের: এমনি দিনে বিগত বছরের কয়েকটা দিন। পিঁপড়ের সারির মত গ্রামের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল চাষাভুষোর দল—ঘিরে ফেললো যত থানা আর সরকারী কর্মশালা। তারপর আগুন জ্বলে ওঠে। সে আগুন এবারও জ্বলে উঠতে পারে আবার দুর্ভিক্ষের শূন্যতায়—বিগত বছরের উদ্যাপন দিনকে স্মরণ ক'রে। ধান নেই, চাল নেই, বিত্ত নেই, সম্পদ নেই—নিরন্নের দল ছুটে আসতে পারে আবার ব্যর্থ কর্মশালাগুলির দিকে। তারই সম্ভাবনায় প্রতিরোধ প্রস্তুতির জন্যে সদর থেকে ছোট ছোট দলে চলেছে সেপাই-শান্ত্রীর দল গ্রামগ্রামান্তরের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে। নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে ওরা। উৎসুক ইসমাইলের কিন্তু যাওয়া হ'লো না কোথাও শহর ছেড়ে। ক্ষুব্ধ ইসমাইল চলেছে ওদের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ ক'রতে ক'রতে।

··· কি আছে এই শহরে! ···

আবার একটা। ··· থমকে দাঁড়ালো ইসমাইল—ব'ললো, জ্বালতো টর্চটা।

একটা নয়—দুটো।

আধখাওয়া দুটো মৃতদেহ পড়ে আছে ইসমাইলের পায়ের কাছে। তীব্র টর্চের আলোয় একটা কুকুর খেঁকিয়ে উঠলো বীভৎস ভাবে।

শালার কুকুর—দে তো বন্দুকটা

শহরে তো রইলিই কুকুর মারার জন্যে। পেছন থেকে একজন ঠাট্টা করে ইসমাইলকে, আমাদের টোটা আর বাজে খরচ ক'রে লাভ কী। ···

হুঁ, নিয়ে যা—যাদের ওরা খাচ্ছে, তাদের জন্যে লাগবে সেখানে। ইসমাইল বলে—কণ্ঠে তার বিদ্রূপ আর ক্ষোভ, কাল থেকে এখানে আমার কুকুর মারার পালা—হুকুম হ'য়ে গেছে আজ।

মৃতদেহ দুটোর পাশ কাটিয়ে আবার এগিয়ে চললো ওরা।

শহরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ইসমাইল এল ওদের সঙ্গে সঙ্গে। তারপর ওদের ছোট দলটি চলে গেল গ্রামমুখো পথ ধরে। ইসমাইল দাঁড়িয়ে রইলো সেইখানে, কান পেতে শুনতে লাগলো তাদের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর— হাসি আর কথা। প্রতিষ্ঠা ··· প্রতিপত্তি ··· সুযোগ ··· গণেশপ্রসাদ—এলোমেলো অসংখ্য চিন্তা তোলপাড় করে ইসমাইলের মনের মধ্যে। ওরা চলে গেল অনেক দূরে ইসমাইলের চেনা এক গ্রামে—যে-গ্রাম পচা ঘায়ের মত কুৎসিত হ'য়ে আছে ইসমাইলের মনের মধ্যে, যে-গ্রাম থেকে সতীর্থ গণেশপ্রসাদ অফিসার হ'য়েছে গত বছরের বিক্ষোভের সুযোগে। মনে পড়েঃ সন্ধ্যার অন্ধকার লাল হ'য়ে উঠেছে আগুনে, দম বন্ধ হ'য়ে আসে ধোঁয়ায়—জনতার আকাশভাঙা চিৎকারে বুক কাঁপে—হাত কাঁপে। পাশে গণেশপ্রসাদ শুধু নির্মম লক্ষ্যভেদ ক'রে চলেছে। ···

ভোর হ'য়ে গিয়েছে। অদূরে ছিটে বেড়ার বিরাট চালা-ঘরটার দিকে তাকালো ইসমাইল। শহরের এক পাশে ওই দুর্ভিক্ষের সরকারী খাদ্য-ভাণ্ডারে রাত্রির পর রাত্রি ধরে' পাহারা দিতে হবে তাকে। ওখানে ক্ষিপ্ত জনতা ভেঙে পড়বে না কোনো দিনই। আর শ্মশানের মত এই শহর। সোজা সড়কের এখানে ওখানে মৃতদেহ ঘিরে কুকুরের জটলা। রাত্রির অন্ধকারে কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরন্নদের অবসন্ন দেহগুলোর ওপরে—ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় সারারাত। ওই কুকুরগুলোকে গুলি ক'রে মারতে হবে—মনে মনে বলে ইসমাইল, আর তারা চলে গেল দলের পর দল···প্রতিষ্ঠা···সুযোগ···সতীর্থ গনেশপ্রসাদ।

ক্ষুব্ধ মনে শহরের দিকে মুখ ফেরালো ইসমাইল।

এমন সময়ে একটা লোক সুমুখে এসে দাঁড়ালো তার, মুখ ভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি—দৃষ্টিতে তার উদ্‌ভ্রান্ত আকুতি।

সেলাম সিপাইজী।

ইসমাইল তাকালো সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে।

লোকটা ভয়ে দু-পা পেছিয়ে গেল। আমতা আমতা ক'রে যা ব'ললো, তার অর্থ: সে একটা কাজ চায়। সরকারী খাদ্যভাণ্ডারের গুদামে অনেক কুলি কাজ করে—সারাদিন ধান-চাল বয়। ইসমাইলকে দেখেছে সে সেখানে পাহারা দিতে। যদি একটা কাজ ক'রে দেয় সেখানে···স্ত্রী-ছেলেমেয়ে তার না খেতে পেয়ে মরছে।···

ব'লতে ব'লতে লোকটা ইসমাইলের পা চেপে ধরে' মাটিতে বসে পড়লো।

দয়া করো সিপাইজী। কুলিদের হেডম্যানকে শুধু একটু বলে দিলেই হবে।

লোকটার দিকে তাকিয়ে সমস্ত রক্ত যেন মাথায় গিয়ে ওঠে ইসমাইলের। সবল পা দিয়ে ছুঁড়ে দেয় সে রুগ্ন লোকটাকে রাস্তার এক পাশে। মনে মনে বলে: এরা—এরাই অসংখ্য জীবনের বিনিময়ে গনেশপ্রসাদকে জীবনের একধাপ উঁচুতে তুলে দিয়েছে। সে-জীবন ইসমাইলের আজ নাগালের বাইরে। শুধু তার সঙ্কীর্ণ জীবনের মধ্যে একটা পশু অন্ধ আবেগে ছট্‌ফট্‌ করে। লোকটাকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে হয় ইসমাইলের।

··· লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ছে না কেন তার ওপর! ···

ইসমাইল চলে গেল শহরের দিকে। লোকটা সেই দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ—তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে অদূরের সরকারী গুদামের দিকে এগিয়ে গেল। ধান আর চাল বোঝাই ট্রাকের সাঁরি এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। কাজ শুরু হ'য়েছে দিনের। কুড়ি-বাইশজন কুলি মাল খালাস ক'রছে গাড়ী থেকে। একটি বৃদ্ধ কর্মচারী দরজার সুমুখে বসে বসে বস্তার ওজন লিখছে।

সেই কর্মচারীটির দিকে তাকিয়ে বসে রইলো লোকটি, অপেক্ষা ক'রতে লাগলো, হেডম্যান হবিব খাঁ কখন ভেতরে গিয়ে ঢোকে।

সে সুযোগ এল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে দাঁড়ালো সে কর্মচারীটির সম্মুখে। তারপর যেন এক নিঃশ্বাসে ব'লে ফেললো তার সব কথা—তার অনশন—তার স্ত্রী-ছেলেমেয়ের কথা।

নাম কি তোর ?

মাধব।

আচ্ছা—আসিস্ তবে কাল থেকে। হবিবকে ব'লে দেবো আমি। রোজের ভাগ কিন্তু দিতে হবে আমাকে দু-আনা ক'রে। তুই পাবি আট আনা।

তাই হবে বাবু।

আনন্দে মাধবের মুখটা অদ্ভুত এক রকমের দেখায়।

তারপর হবিব এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো দম্‌কা হাওয়ার মত। ব'ললো, ও কি এই জুলুমের কাজ পারবে ?

কেন ?

ও তো খোঁড়া।

চিনিস্ ওকে ?

একই গাঁয়ের লোক—চিনি বৈ কি। আর বছর স্বদেশী হাঙ্গামের সময় থানা ভাঙতে গিয়ে গুলি এসে লেগেছিল পায়ে। তার পর পালিয়েছিল কোথায়। ···

পুলিসে ধরে নি ?

তারা ধরে নি মাধবকে—মাধবের মত চাষাভুষোকে। কেন ধরে নি—জানে না মাধব। শুধু জানে—গ্রামে খাদ্য নেই, অর্থ নেই—বিশ্বসংসার জুড়ে শুধু নেই নেই, আর জীবন জুড়ে নেমে এসেছে আদি-অন্তহীন একটা হতাশা। এই একটা বছরের মধ্যে সংসার তচনচ্ হ'য়ে গিয়েছে তার—বলদ গিয়েছে, জমি গিয়েছে—খোঁড়া হ'য়ে গিয়েছে একটা পা। কোনো দাম আজ আর নেই তার। দু-হাতে বৃদ্ধ কর্মচারীটির পা জড়িয়ে ধরলো মাধব ব্যাকুল ভাবে :

বাঁচান বাবু। ···

আরে ··· খোঁড়াকে নিয়ে ক'রবো কি! বের ক'রে দে ··· বের ক'রে দে—এই হবিব! ···

কুলিরা ঠেলে ফটকের বাইরে বার ক'রে দিল মাধবকে।

রাস্তার ওপরে মাধব দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ বিহ্বল হ'য়ে। এর পর কোথায় যাবে সে—ভেবে পেল না। মনে পড়লো না তার গ্রামের কথা, মনে পড়লো না তার ঘরের কথা—মনে পড়লো না একবার, তার ফেরার জন্যে ব্যাকুলভাবে কেউ প্রতীক্ষা ক'রছে। আজ দু-দিন কেটে গেল তার শহরে।

তারপর হঠাৎ চমকে উঠলো সে বন্দুকের আওয়াজে। তাকিয়ে দেখলো, কুকুরগুলো একে একে লুটিয়ে পড়ছে আধ-খাওয়া মৃতদেহগুলোর পাশে—আর সকালের সেই সেপাইটা বন্দুক হাতে এগিয়ে আসছে যেন তারই দিকে। ইসমাইল আসছে—সঙ্গে আরও কয়েকজন সেপাই। হঠাৎ কেমন ভয় হয় মাধবের। সে-ও যেন মরে যাবে ওই কুকুরগুলোর মত এখখুনি। কয়েক মুহূর্ত সে চেয়ে রইলো হতাশ ভাবে—যেন নিজেকে বাঁচাবার কোনো ক্ষমতা নেই আর তার।

তার পর হঠাৎ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটতে আরম্ভ ক'রলো মাধব—জীবনের অন্ধ তাড়নায়—যে-জীবন মরেও মরে না।

ছুটে গিয়ে কোথাও লুকোতে চায় সে।

বৌকে দেখেও অমনি লুকোবার চেষ্টা করে মাধব। কিন্তু লুকিয়ে থাকার জায়গা নেই তার। ওই ছোট একটু শহর মাঠের পাশে—সোজা একটি সড়কের দু-ধারে তার ব্যবসা, বাণিজ্য আর সমৃদ্ধি। সেই ভিড়ের মাঝখানে দেখা হয় ময়নার সঙ্গে মাধবের—যেমন ক'রে দেখা হয় সারা দিন অসংখ্য বুনো পশু আর পাখীর।

এড়িয়ে চলে মাধব। আর মাধবের বৌ বছর চারেকের একটা চামচিকের মত ছেলেকে কোলে ক'রে অসংখ্য ক্ষুধার্তের ভিড়ে এসে মিশে গেল একদিন।

তারা ভিড় করে গুদামঘরের সুমুখে। ধান-চাল বোঝাই ট্রাকগুলো ভোর থেকে এসে সার বেঁধে দাঁড়ায়। মাল খালাসের সময় ছেঁড়া ফুটো বস্তা

দিয়ে ধান-চাল যা পড়ে মাটিতে—তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি করে সকলে, সারাদিন। আর রাত্রির অন্ধকারে কুকুরের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিবাদহীন ঘুমন্ত অবসন্ন দেহগুলোর ওপরে। গুলি খেয়ে মরে—তবু আসে, গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ছুটে আসে মানুষের সঙ্গে দিনের পর দিন—মানুষের মত, আর মরে।

মাধব আশে-পাশে ঘোরে গুদাম ঘরের, আর কি যেন ভাবে—অসংখ্য এলোমেলো ভাবনা। পাঁজরের হাড়গুলো ক্রমশ সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, মুখের দাঁড়ি-গোঁফে কেমন জন্তুর মত দেখায় তাকে।

তার পর একদিন রাত্রির গভীর অন্ধকারে হঠাৎ চোখ দুটো জ্বলে উঠলো সেই জন্তুটার। নিঃশব্দ অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো সে—ইস্‌মাইলের টর্চের আলো ময়নার মুখে ঝল্‌কে উঠে নিভে গেল। হাসছে ময়না, এসে দাঁড়িয়েছে গুদামঘরের ফটকের সুমুখে। কোলের ছেলেটা ঘুমে ঢুলে আছে কাঁধের ওপরে।

তার পর পাশের একটা দোকানের চালার মধ্যে ছেলেটাকে শুইয়ে দিয়ে ময়না ফটকের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো—মিশে গেল গভীর অন্ধকারে।

মাধব দাঁড়িয়ে রইলো একভাবে। তার পর হঠাৎ সে চমকে উঠলো একটা ক্ষীণ আর্তনাদে। গোটা তিনেক কুকুরের চাপা গোঙানিতে সে আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল। অন্ধকারে দেখা যায় না—তবু তার মনে হয়, ময়নার শুইয়ে আসা ঘুমন্ত ছেলেটার ওপরে মারামারি ক'রছে কুকুরগুলো। অসহায় ভাবে মাধব দাঁড়িয়ে রইলো ঠায়। যেন কিছু একটা ক'রতে গেলে সে শান্তিভঙ্গ ক'রবে নিঃশব্দ নিবিড় এই প্রশান্ত রাত্রির।

কিছুক্ষণ পরে ময়নার অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল গুদামঘরের ফটকের ভেতর থেকে। ছেলেটাকে যেখানে শুইয়ে রেখে এসেছিল—সেখানে গিয়ে হঠাৎ একটা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে উঠলো সে। কুকুরগুলো গ্রাস ভরা মুখে দাঁতে দাঁত চেপে গোঁ গোঁ ক'রে উঠলো তাকে দেখে।

তার পর সেই সুগভীর অন্ধকারে কান পেতে শুনলো মাধব—যেন একটা কান্না—খুব অস্পষ্ট চাপা একটা কান্নার সুর। বুকের মধ্যে কেমন যেন শিরু শিরু ক'রে উঠলো তার—কেমন যেন ভয় পায়।

ইসমাইলও শুনলো সেই কান্না কয়েক মুহূর্ত উৎকর্ণ হ'য়ে—তার পর তার ভারি বুটের শব্দে চাপা পড়ে যায় সব। পায়চারি করে ইসমাইল আর ভাবে: শুধু মৃত্যু ··· ক্ষুধা ··· মৃত্যু—কি আছে আর এই শহরে! তারা চলে গিয়েছে দলের পর দল ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ··· অর্থ ··· প্রতিপত্তি ··· গণেশপ্রসাদ। ··· যেমন ক'রে বেগবান রাঙা বন্যার জলস্রোত হঠাৎ নদীর বাঁকে বাধা পেয়ে প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকে—তেমনি ক'রে ঘোরে ইসমাইল। ··· এই নিঃশব্দ শহরের প্রান্তে ··· এই খাদ্য-ভাণ্ডারের দিকে কোনো দিন ছুটে আসবে না কেউ। হতভাগা ইসমাইল—কোথাও যাওয়া হ'লো না তার। নিজেকে ধিক্কার দেয় ইসমাইল। ··· আর গণেশপ্রসাদ ··· আর বছরের সতীর্থ গণেশপ্রসাদ ··· অর্থ ··· প্রতিপত্তি ··· পুরস্কার।

পরদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে ময়নাকে খুঁজে বের ক'রলো মাধব। তার পর অনেকক্ষণ ধরে চাপা গলায় ওরা কি যেন আলোচনা করে। ময়না কাঁদে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

ওরা বসে রইলো দু-জনে গভীর রাত্রির অপেক্ষায়।

তার পর রাত্রি গভীর হ'ল। ওরা দুজনে এগিয়ে চললো গুদাম ঘরের দিকে। কাছাকাছি এসে থম্‌কে দাঁড়ালো মাধব। চাপা গলায় ব'ললো:

এবারে তুই যা। যতক্ষণ পারিস—দেরি করিস।

মাধব দাঁড়িয়ে রইলো। ময়না এগিয়ে গেল। গিয়ে দাঁড়ালো ফটকের কাছে। ইসমাইলের টর্চের আলো ঝলকে উঠলো ময়নার মুখে। তার পর ময়না ফটক ঠেলে ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দুই হাতে চোখ ঘষে জানোয়ারের মত দেখে মাধব। তারপর পথ ছেড়ে খানিকটা ঘুরে এসে দাঁড়ালো গুদামঘরের পেছনে। হাতে শুধু একটা কাস্তে।

সেই কাস্তে ঘষে ঘষে সন্তর্পণে মাধব গুদাম ঘরের ছিটেবেড়া কাটে। কিছুটা ফাঁক হ'লো কিছুক্ষণ পরে। তারপর সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়লো সে ঘরের মধ্যে। চালের ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এসে লাগে মাধবের। কিন্তু দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে তার, আর বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটছে।

বিরাট একটা চালের বস্তা নিয়ে টানাটানি করে মাধব—যেন সেটা একটা পাহাড়। এতটুকু নড়াবার শক্তি নেই তার।

বস্তার মুখ কেটে কিছুটা চাল ফেলে দিয়ে আবার টানাটানি করে মাধব আর ব্যর্থ হয়ে হাঁপায়। আরও কিছুটা চাল ফেলে দিল সে।

··· এত অপচয়, আঃ—এই সমস্ত চাল যদি নিয়ে যেতে পারতো সে। ···

তার পর বস্তাটাকে কোনো রকমে টানা-হেঁচড়া করে বাইরে নিয়ে এলো মাধব। বার কয়েক চেষ্টার পর মাথায় তুললো সেটাকে। তার পর সন্তর্পণে কোনো রকমে এগিয়ে চললো বালির ওপর দিয়ে।

কিছুটা এসে পা টলে—মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার—পায়ের তলার মাটি যেন নাচছে—সুমুখের অন্ধকার পথ হারিয়ে যাচ্ছে গভীরতর অন্ধকারে।

তার পর মাথার বোঝা ছিটকে পড়লো একদিকে—আর মাধব টলতে টলতে পড়ে গেল মাটিতে। অন্ধকার আকাশ আর পৃথিবী ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল আর এক অন্ধকারে। বহু দূর থেকে যেন কুকুরের ডাক শোনা যায়, আর তাদের দ্রুত পদধ্বনি।

অন্তিম মৌসুমী রাত। অশ্রান্ত ঝিঁঝিঁ আর ব্যাঙের ডাক। মেয়েটা চলে গিয়েছে। ইসমাইল বিড়ি টানতে টানতে বন্দুকটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কতকগুলো কুকুর চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল গুদামঘরের পেছন দিকে। ইসমাইল টর্চ জেলে বন্দুক ঘাড়ে এগিয়ে চললো সেইদিকে।

··· কুকুর মারতে হবে তাকে ··· আর তারা চলে গেল দলে দলে ···

মাধবের সিঁদ কাটা জায়গাটায় ইসমাইলের টর্চের আলো ঝলকে উঠলো, আর ছ্যাঁৎ করে উঠলো তার বুকটা। গণেশপ্রসাদের কঠোর মুখটা ভেসে উঠলো তার চোখের সুমুখে।

… অনেক নয় … তারা আসবে না এখানে কোনোদিন … শুধু একটা … অন্তত একটাকে গুলি করবে সে … এবার আর হাত কাঁপবে না—বুক কাঁপবে না। …

একটা অতিকায় যন্ত্র যেন বিদ্যুতের স্পর্শে হঠাৎ গর্জন করে উঠলো তার বুকের মধ্যে।

টর্চের আলো ফেললো চারিদিকে ইসমাইল। কিছু দূরে কয়েকটা কুকুর জটলা ক'রছে। টর্চের আলো ফেলে শক্ত মুঠিতে বন্দুক ধরে' সেই দিকে এগিয়ে গেল সে।

চালের বস্তাটা পড়ে আছে একটু দূরে। কয়েকটা কুকুরের গোঙানি আর ধারালো দাঁতের মাঝখানে ছটফট্ ক'রছে একটা লোক।

সেই নিঃশব্দ নিবিড় অন্ধকারে পাশাপাশি দুটি আদেশ—কুকুর আর মানুষ … আর মৃত্যু, সব যেন এক নিমেষে গোলমাল হয়ে যায়। কঠিন হাতে বন্দুক ধরে' কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ আর বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ইসমাইল : কাকে গুলি করবে সে ? মানুষ না কুকুর ? …

১৩৫১

অসুখ

পোড়াধানের চাপা ভ্যাপসা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে।

অদূরে এক সার উনুনের ওপরে বড় বড় মাটির হাঁড়িতে ধান সেদ্ধ হ'চ্ছে। কোন হাঁড়িটার যেন জল শুকিয়ে ধান পুড়ছে। মেয়েরা তবু তফাতে ব'সে কি যে এক গভীর বিষয় নিয়ে বিভোর হ'য়ে আছে সব—উঠে দেখবার গা নেই কারুর।

বুড়ো অন্ধ মহেন্দ্র, [illegible] পাকাচ্ছিল এক পাশে ব'সে ব'সে। পোড়া গন্ধ নাকে এসে লাগতে ব'লে উঠলো, যাঃ, মেয়েরা সব গেল কোথায়! সাড়াশব্দ পাচ্ছিনে কারুর—ইদিকে ধান পুড়ে খাক্ হ'য়ে গেল যে কার!

ধান পুড়ছিল যার হাঁড়ির—এবার উঠে দাঁড়ালো সে। গজ্ গজ্ ক'রতে ক'রতে ব'ললো, চেঁচায় যেন যাঁড়ের মতো। পুড়লো তো ভারি ইয়ে হ'য়ে গেল।

নারায়ণীর গলা।

মহেন্দ্র ব'ললো, অতো হেনেস্তা করিস নি নারাণী—ওই একমুঠোর জন্যে পড়ে আছিস্ এইখানে। তোর নিজের ঘরে হ'লে কি ক'রতিস্ এতক্ষনে?

কতো যেন সোয়ামীপুত্তুরেরা খাবে সব।

মহেন্দ্র দড়ি পাকাতে পাকাতে ব'ললো, এই দড়িতে আমারই বা কোন চোদ্দচালার ঘর উঠবে? সায়েবের ন্নাকে একবার গন্ধ গেলে আর রক্ষে আছে! —খাচ্ছিস্, কাজ দিবিনে? চারদিকে তোদের হেলা-ফেলা—চারদিকে—

নারায়ণী রুখে উঠলো, তোমাকে আর ফোপরদালালি ক'রতে হবে না। তোমার নিজের কাজ ছাখো।

ব'সে কি আর খাচ্ছি, কাজ ক'রেই খাচ্ছি। আমি তো আর সায়েবের পেয়ারের কেউ নই যে—

নারায়ণী জ্বলে উঠলো দপ্ ক'রে। ব'ললো, ঘাঁটিও না ব'লছি—বলি ডাকবো না-কি মালতীকে, পায়ে-হাতে ধরবে একবার সেদিনকার রাত্তিরের মতো? আজ সায়েবকে আমি সব ব'লবো। বুড়োর আবার সখ্ কতো—

দূরে দাঁড়িয়ে মালতী হাসে খিল্ খিল্ ক'রে। বৈশাখের মাঠভাঙা বাতাসের ঝাপ্টায় রুক্ষ চুলগুলি উড়ে এসে পড়ে তার গালের ওপরে, পরিপূর্ণ উদ্ধত বুকের ওপর থেকে আঁচল খসে পড়ে হাওয়ায়। হাসে মালতী। হাসে শকুনের মতো সরুগলা রোগা ছেলেগুলো।

ঘর নয়, যেন উচ্ছৃঙ্খল একটা গোরুর খোঁয়াড়। একটি মফঃস্বল শহরের উপকণ্ঠে নিঃস্বদের সরকারী আশ্রয়। গুটি তিরিশ [illegible]লে-মেয়ে-বুড়ো তাল-গোল পাকায় তার মধ্যে। ধান ভানে, দড়ি পাকায়, খায়—আর ঝগড়া করে।

তার পর হঠাৎ একদিন এলো ঘরের ডাক, গ্রামে ফেরার ডাক। যাদের কোনো আত্মীয়-স্বজন বা ঘর-দোরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তাদের চলে যেতে হবে এখান থেকে।

মুখ চাওয়া-চাউয়ি করে সকলে। হঠাৎ একটা কালো ভয় যেন থম্ থম্ করে ওদের চোখে মুখে।

বিরাট চালাটার কোল ঘেঁষে বৈশাখের রিক্তপ্রান্তর ধূ ধূ ক'রছে চারদিকে। ওদের মনের মাঝখানেও ওইরকম ধূ ধূ ক'রছে একটা বিভ্রান্ত নিঃস্ব প্রান্তর। অনশন, মৃত্যু আর দুর্ভিক্ষ! ভয় লাগে ওদের। কিছুক্ষণের জন্য চরম অসহায়তার

মাঝখানে হঠাৎ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটা অবলম্বনের জন্য যেন হাত বাড়িয়ে দেয়, পরম আত্মীয়তার সঙ্গে বসে গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে!

তার পর ভেঙে ছিটকে পড়ে সবাই আবার সশব্দে কাঁচের টুকরোর মতো।

মহেন্দ্র ব'ললো, বুড়ো অন্ধ মানুষ আমি, আমাকে কি আর যেতে ব'লবে! আমি থাকবো।

নারায়ণী ব'ললো, ঘর আছে, সোমত্থ ছেলে আছে। রাখবে বৈ কি তোমাকে! সায়েবকে ব'লবো আমি সব।

বুড়ো মহেন্দ্র কাঁদতে আরম্ভ করে হঠাৎ হাউমাউ ক'রে: তোর পায়ে পড়ি নারাণী—বলিস্ নি সাহেবকে। অতো বড়ো আকাল গেল—ছেলে খেতে দিল না একমুঠো। ··· মেয়ে জামাই তাড়িয়ে দিল।

ছানি পড়েছে সৌরভীবুড়ীর চোখে। সে ব'ললো, আমি থাকবো, আমার আর কে আছে।···

মালতী রুখে উঠলো, না—তোমার আর কে আছে! ··· মেয়ে জামাই, লোকভর্তি সংসার ···

তোকে কে দালালি ক'রতে ব'লছে লা! খ্যাঁক ক'রে উঠলো সৌরভী, থাকিস্ এইখেনে তুই—দোকান পেতে বসিস্। তোর স্বোয়ামী আছে না? ঘর-দোর নেই তোর?

ঘর ছিল মালতীর, স্বামী ছিল। তার দাগ এখনও আছে তার গায়ে। আকালের উৎপীড়নের দাগ। মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল মালতীকে একদিন তার স্বামী। কেমন ভয় করে তার।

পরস্পর ঝগড়া করে ঘর নিয়ে। ঘরের কথা কেমন একটা বিভীষিকার মতো ভাসে ওদের চোখে। কুৎসিত কলহে পরস্পর খোঁচাখুঁচি করে। সকলেই চিৎকার ক'রে যেন ব'লতে চায়—ঘর নেই কারুর, নেই কোনো আত্মীয়-স্বজন।

ওদের চারদিকে ধূ ধূ করে বৈশাখের রিক্ত প্রান্তর নিঃশব্দে। হাড়গিলের মতো ছেলেগুলো শুধু নির্বিকার। নিঃশব্দে নতমুখে হাড়বেরুনো আঙুলে ধানের কণিকাগুলি খুঁটে খুঁটে মুখে পুরে চলেছে, যতক্ষণ দিনের আলো থাকে।

তার পর সায়েব—অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানের সরকারী তত্ত্বাবধায়ক ওদের মাঝখানে দাঁড়ালো এসে একদিন, সঙ্গে একজন কেরানী—হাতে নামের লম্বা ফর্দ। পেছনে পেছনে কয়েকজন চৌকিদারও এসে দাঁড়ালো।

যাদের চলে যেতে হবে—তাদের নাম ডেকে গেল একে একে কেরানী। অধিকাংশই বরখাস্ত হ'য়ে গেল। মেয়েদের ভেতর থেকে নারায়ণী বাদ পড়ে গেল শুধু। বাঁশের একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে পরিপূর্ণ যৌবনের নিশান উড়িয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো সে। চোখে-মুখে তার চাপা হাসি। আর কতক-গুলো মাথা নেড়া ছেলে দাঁড়িয়ে রইলো তার পাশে শুকনো চারা গাছের মত।

বরখাস্ত হ'য়ে গেল যারা—তারা শুধু চাপা গলায় বলে: নারাণী র'য়ে গেল—যে? ওর তো স্বামী আছে! ওর তো ঘর আছে! ...

চুপ্। ... পাশের চৌকিদার একজন ধম্‌কে উঠলো, শোন না—

আতুরাশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক তখন ব'লে চলেছে গ্রামের কথা, ঘরের কথা। সেখানে ভয় নেই কোনো আর। ধান ভালো হ'য়েছে। ফিরে যাক সকলে ঘরে। চৌকিদারেরা পথ দেখিয়ে দেবে গ্রামের।

এক গ্রামের মেয়ে সৌরভী আর মালতী। নদী পেরিয়ে যেতে হবে তাদের গ্রামে। গ্রামের পথে তাদের পৌঁছে দেওয়ার জন্যে সঙ্গ নিল শ্রীনাথ চৌকিদার। গাছের আড়ালে ধীরে ধীরে আড়াল হ'য়ে গেল শহরের উঁচু চিলকোঠা আর আড়তদারদের টিনের চালাগুলো। তার পর গঞ্জের বাজার পেরিয়ে খেয়াঘাট পর্যন্ত হেঁটে এল ওরা। সৌরভী লাঠি ঠুকে ঠুকে শ্রীনাথ আর মালতীর পায়ের শব্দ চলেছে অনুসরণ ক'রে। তার পর হঠাৎ সে থম্‌কে দাঁড়ায় পায়ে ভেজা মাটি ঠেকতে।

ও চৌকিদার, খেয়াঘাটে এলাম বুঝি!

দূর থেকে শুধু মালতীর খিল্ খিল্ হাসির শব্দ শোনা যায়। উচ্ছ্বসিত সে হাসি মিলিয়ে গেল আরও দূরে—নির্জন নদীতীরের একটা ঝুপ্সি জঙ্গলের আড়ালে।

নিঃশব্দ খেয়াঘাট, খেয়াও নেই—মাঝিও নেই। সন্ধ্যার অন্ধকার গভীর হ'য়ে এলো চারদিক থেকে।

সৌরভী ছানিপড়া চোখ ঘুরিয়ে লাঠির খোঁচা মারে চার দিকে আর গাল পাড়ে শ্রীনাথ আর মালতীকে। লাঠি ঠুকে ঠুকে জলের কিনারের ভেজা মাটি ছেড়ে ফিরে এল শুকনো মাটিতে সৌরভী।

তার পর সে নদী আর ওরা কেউ পেরুলো না কোনোদিন—না সৌরভী, না মালতী।

খেয়াঘাটের কিছুদূরে ক্যানেলের মুখে লক্ গেট—আর তারই পাশ ঘেঁষে গঞ্জের বাজার। সেই বাজারে আবার দেখা হয় সৌরভী আর মালতীর। রাত্রিতে মাথা গুঁজে পড়ে থাকে দোকানের চালার ভেতরে। নদীর ওপারে মাঠভাঙা গ্রামমুখো যে পথ—সে যেন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গিয়েছে ওদের মনের গভীর থেকে। ভালো আছে মালতী। শুধু সৌরভী মাঝে মাঝে দোকান থেকে দোকানে তাড়া খেয়ে খেয়ে গাল পাড়ে শ্রীনাথকে, গাঁয়ে নিয়ে যাবে—ঘরে নিয়ে যাবে হারামজাদা, জাহান্নামে নিয়ে যাবে। ··· হতভাগী ছুঁড়িই যতো নষ্টের গোড়া।

মালতী খোঁচা দিয়ে বলে, যা না তুই ঘরে।

যাবোই তো। আমার মেয়ে-জামাই, গোলা ভরা ধান—অভাব কিসের আমার। যাবোই তো! তুই থাকিস্ এইখানে দোকান পেতে—সাধের যৈবনের দোকান। সর্বনাশ হবে। ···

কিন্তু ভুলেও কোনোদিন কেউ বাজারের এলাকা ছেড়ে দাঁড়ায় না খেয়াঘাটের পাশে এসে, খোঁজ করে না নদীর পরপারের পথটার।

খোঁজ ক'রতে এল বিনোদ, গ্রামের কার কাছে খবর পেয়ে। বাজারের এক প্রান্তে সরকারী রিলিফ ডাক্তারখানা। সেখান থেকে কুইনাইন এক শিশি নিয়ে মালতীকে খুঁজতে লাগলো সে বাজারের মধ্যে। চোখে তার মালতীর স্বপ্ন—ঘর বাঁধার স্বপ্ন।

রিক্তদিনের ইতিহাস আজ চাপা পড়ে গিয়েছে তার ক্ষেতের ফসলের উচ্ছ্বসিত বন্যায়—গোলায় তার ধান, ভাঙাঘরের জীর্ণ কাঠামোতে নতুন খড় ওঠবার জন্যে গাদা হয়ে আছে প্রাঙ্গণে, মন দুল্‌ছে তার একটি মেয়ের জন্যে।

বিনোদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত নতমুখে মালতী ফিরে এলো ঘরে—বোবা মালতী।

আশ্চর্য! বিনোদের মনে অন্তরঙ্গতার আবেগ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে না। কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকে তার। আদ্যোপান্ত চেনা আর জানা মালতীকে যেন নতুন ক'রে চিনতে হবে তাকে, জানতে হবে। কেমন বিব্রত বোধ করে বিনোদ।

কাঁথা মুড়ি দিয়ে জ্বরের ঘোরে ধুঁকছিল কালী, বিনোদের বোনের ছেলে। সাগ্রহে তাকে কেন্দ্র ক'রেই হাসিতে উছলে উঠলো বিনোদ, আকালে বাপ-মা মরে গেল দেখে এনে রেখেছি ছেলেটাকে। ক-মাস শুধু ভুগছে জ্বরে।

কালীর মাথার কাছে ওষুধের শিশিটা রেখে আবার ব'ললো, সেরে উঠবি এবার—সেরে উঠবি। ব'লে তাকালো সে মালতীর মুখের দিকে।

মালতী যেন বোবা।

মালতী চোখ তুলে ঘর-দুয়ার দেখে। ভেঙে খসে পড়া চাল, ধুয়ে ধসে আসা মাটির দেয়াল! এক পাশে কালী কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে, রান্নাঘর হ'য়েছে দাওয়ার এক পাশে। কালিতে কালো হ'য়ে উঠেছে মাটির দেয়াল। চেনা আর অচেনার মাঝখানে কেমন যেন তার দম বন্ধ হ'য়ে আসে। বিনোদ কোথায় বেরিয়ে গিয়েছে। কি ক'রবে সে ভেবে পায় না। চুপ ক'রে ব'সে থাকে আর মনে মনে ঘুরে আসে মাসের পর মাস। সে দুরন্ত পথের,

মাঝখানে ঘেরাটোপ দিয়ে কোনো একটি ঘর তার দম বন্ধ ক'রে আনে না, সে মুক্ত স্বচ্ছন্দবিহারী জীবনের মাঝখানে দায়িত্বের কোনো সঙ্কীর্ণতা নেই। কালী জলের জন্যে চিঁ চিঁ ক'রে ডাকে। বোবা মালতি যেন কালা হ'য়ে গিয়েছে। নিঃশব্দ আর স্তম্ভিত! যেন হঠাৎ একটা মেলার বাইরে এসে পড়েছে সে। কলরব শোনা যায় শুধু দূর থেকে।

তার ফিরে আসার খবর পেয়ে কয়েকটি প্রতিবেশিনী এলো তাকে দেখতে।

একি ছিরি হয়েছে তোর মালতী!

তেলের অভাবে কটা রং ধরেছে চুলে। গলার কাছে—বুকের কাছে ময়লা বসেছে পুরু হ'য়ে, পাশে ঘেঁষে বসা যায় না—কেমন একটা আঁসটে গন্ধ সর্বাঙ্গে। কতদিন স্নান করে নি মালতী! আড়ময়লা কাপড়টা নোংরাতে ভর্তি।

পালিয়ে গিয়ে কি সুখে ছিলি বল্ দিকিন্! সে-ই তো আমরা বেঁচে আছি। কষ্টে অভাবে যাই হোক ক'রে ঘরের কোণে মুখ গুঁজে পড়েছিলুম তো! ··· ঘর-দোরের কি ছিরি হ'য়েছে ছাখ দিকিন্।

স্বামী ছেড়ে, ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল মালতী—ছেড়ে পালিয়েছিল সুখের ঘর-সংসার।

কিন্তু সুখের এই ঘর-সংসারে দিনের পর দিন অনশন, স্বামীর প্রহারে মুখ বুজে পড়ে থাকা আর কাজের চাকা ঘুরিয়ে বছরের পর বছর ছেলে পেটে ধরা! কপালে কাটা দাগ স্বামীর প্রহারের — সেই হরিমতী বলে, আমরা কি মরে গিয়েছি?

জ্বলে উঠলো মালতী, আমি গিয়েছিলুম—তাতে তোদের কি লা?

হরিমতী অস্ফুট কণ্ঠে ব'লে গেল, সাত জায়গায় ঘোরা ও মেয়ে, এবার টের পাবে বিনোদ। ···

ঠায় বসে রইলো মালতী। কতকগুলো অদৃশ্য বেড়ি যেন বাঁধতে আসছে তাকে চারিদিক থেকে। তার পর ঊর্ধ্বশ্বাসে সে ছুট দেয় গঞ্জের বাজারে, সরকারী আশ্রয়ে—দায়িত্বহীন উচ্ছৃঙ্খল জীবনের বাধা-বন্ধনহীন প্রান্তরে।

এরা এখানে বেঁচে আছে—সে-ও তো সেখানে মরে যায় নি! কষ্ট ··· অভাব, কবে কোনোদিন সেখানে পেয়েছে বলে মনে তো পড়ে না মালতীর!

নারায়ণীকে মনে পড়ে—ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুলে ওঠে তার মন। সে না এলে মালতী হয়তো থেকে যেত সেই সরকারী আশ্রয়ে। শেষ পর্যন্ত কোথা থেকে এসে জুটলো নারায়ণী—নষ্ট হ'য়ে গেল সব আশা মালতীর। তার ফর্সা রং কালি দিয়ে কালো ক'রে দিতে ইচ্ছে হয় মালতীর—তার নিজের রঙের মতো ক'রে।

অন্যমনস্ক মালতীকে সচকিত ক'রে গলা খাঁকারি দিয়ে ঢুকলো বিনোদ। হাতে তার নতুন শাড়ী একখানা। মালতীর গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে ব'ল্লো. দ্যাখ্ দিকিন।

বিগলিত হয়ে হাসে বিনোদ।

এ যেন অতি-পরিচিত একটা হাসি। মালতীর মনে পড়ে সরকারী আশ্রয়ের হাফপ্যাণ্টপরা সেই সায়েবের হাসি, কতোদিনের কত পথের পাশের হাসি কিছু একটা দেওয়ার ছলে, একটা ছেঁড়া কাপড় বা দু-মুঠো খেতে দেওয়ার ছলে। চমক লাগে এই সবগুলো হাসির সাদৃশ্যে। কি চায় বিনোদ?

ঘর ··· সংসার ··· স্বামী।

বিনোদ ব'ললো, রান্না হবে না না-কি! ওঠ—

সেই রান্না-বাড়া, খাওয়া-দাওয়া আর শোয়া। মনের মাঝখানে ওর 'না না' ক'রে ওঠে।

বিনোদ ব'ললো, কালীকে একটু সাবু তৈরী ক'রে দিস্। এই সাবু এনেছি। এই কটি সাবু—এক টাকা। সাতদিন যেন হয়।

সেই অভাব-অভিযোগ, টেনে-চলা দিন। একজন পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণে মুখ বুজে পড়ে থাকা—খাঁওয়া আর শোওয়া।

সে ত মরে ছিল না—সে ত কই মরে যায় নি! মনে মনে বলে মালতী।

বিনোদ মাকড়সার মত জাল বোনে।

একদিন সে পুরাতন ভেঙে খসে পড়া চালের খড় টেনে নতুন ক'রে ছাইবার জন্যে মেতে উঠলো। ব'ললো, খড়গুলো তুলে দিস তুই—একাই ছেয়ে নেবো আমি। লোক ক'রলে খেতে দিতে হবে তো—কি দরকার। ···

পুকুর থেকে কলসী কলসী জল বয়ে আনে মালতী—আর জল ঢেলে ঢেলে শক্ত নতুন খড়গুলোকে ভিজিয়ে নরম ক'রে তুলে দেয় বিনোদের হাতে।

গুন্ গুন্ করে কি যেন একটা গান গায় বিনোদ।

খড় তুলে দিতে দিতে মালতী নিঃশব্দে চেয়ে থাকে দূর মাঠের দিকে। দিগন্তবিলীন বৈশাখের ওই রিক্ত প্রান্তর পেরিয়ে মন চলে যায় তার। কোথায় একটা চালা ঘর আছে শহরের পাশে ··· আর সেই গঞ্জের বাজার ··· আলস্যঘন স্বেচ্ছাচারী দিন—বাধা-বন্ধনহীন। ভালো লাগে না মালতীর আর এই সহস্র বন্ধনের, সহস্র দায়িত্বের—সহস্র অভাবের জীবন। ··· নেশা লাগে না—পীড়ন করে। হরিমতী—হরিমতী কি সুখী?

চালের ওপর থেকে বিনোদ খেঁকিয়ে উঠে ব'ললো, হাঁ করে দেখছিস কি। দে চটপট খড় তুলে।

বিনোদকে হঠাৎ কেমন ভয় করে মালতীর।

এই ভয় টেনে চলা দিনের পরদিন—এই ঘর, এই সংসার। হঠাৎ তার মনে হয়, এখানে তার নিজের কিছু নেই। আবার একদিন হয় তো তাড়িয়ে দেবে বিনোদ মেরে।

তারপর আবার সেই গঞ্জের বাজার। সব ঠিক আছে—আড়তদারের সেই হাসি, ক্যানেলের মুখে হাটুরে নৌকোর ভিড় আর মাঝি-মাল্লাদের ইঙ্গিতময় আহ্বান। শুধু সৌরভী নেই। আর একটা কে আধাবয়সী মেয়ে দুটো ছেলে নিয়ে এসে জুটেছে।

সরকারী রিলিফ ডাক্তারখানায় কেউ ছিল না—এক ডাক্তারের বেয়ারা ছাড়া। দুয়ার ভেজানো। তার পর হুড়মুড় করে কোথা থেকে এসে পড়লো ডাক্তার

সাইকেল ক'রে। দুয়ার ঠেলে আচমকা ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো ডাক্তার—তার পর তেড়ে এল মালতীর দিকে।

ঠক্ করে একটা দুয়ানী পড়ে গেল মালতীর চমক খাওয়া হাত থেকে। সেটা আবার কুড়িয়ে নিয়ে আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বেরিয়ে এল মালতী বাইরে।

ডাক্তারের তর্জন শোনা যায় বেয়ারার ওপরে, ফের যদি ওই সব মেয়ে মানুষ ঢোকাস এই ঘরে—দূর করে দেবো। শূয়ার—

মালতী শোনে আর এগিয়ে যায়। কেন যেন হাসি পায় তার।

তার পর পড়লো একেবারে বিনোদের মুখোমুখি।

ঘরে চল।

না।

চল মালতী। মালতীর একটা হাত ধরে বিনোদ।

হঠাৎ একটা চিৎকার ক'রে মাটিতে বসে পড়লো মালতী।

আস্তে আস্তে ভিড় জমে যায় ওদের চারপাশে।

খেতে দেবে না—পরতে দেবে না, তার ওপরে চেলা কাঠের দাগগুলো মালতীর পা থেকে মুছে যায় নি এখনও। চিৎকার ক'রে বলে মালতী—যাবে না সে মরতে, ভিখিরীর মতো খেয়ে বাঁচতে।

এতগুলো লোকের সকৌতুক দৃষ্টির মাঝখানে বিনোদ দাঁড়িয়ে রইলো বোকার মত আর মালতী চলে গেল ভিড় ঠেলে। হঠাৎ চোখ পড়ে তার ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার বাইরে বেরিয়ে এসে চেয়ে আছে তাদের দিকে। সেই দিকে এগিয়ে গেল বিনোদ।

ডাক্তারের সপ্রশ্ন মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলো, মিছে কথা—সব মিছে কথা ডাক্তারবাবু।

উত্তেজনায় দম নেয় বিনোদ।

তার পর আবার ব'ললো, ওর মাথা যেন একটু গরম হ'য়ে গিয়েছে ডাক্তারবাবু। ওষুধ-টষুধ একটু দিলে হয়তো সারতো। সেদিন কাপড় এনে

দিলাম। নতুন ঘর তুলবো ভেবেছিলাম ডাক্তারবাবু, কাজও আরম্ভ ক'রেছিলাম।

ডাক্তার শুধু ব'ললো, সবই তো বুঝলুম কিন্তু সরকারী ডাক্তারখানায় ও রোগের ওষুধতো নেই বিনোদ !

সারি সারি শিশি-বোতলে এত ওষুধ আছে—ওই ওষুধটা নাই সরকারী ডাক্তারখানায় ! বিপুল অবিশ্বাস আর হতাশা ফুটে ওঠে বিনোদের চোখেমুখে। ওষুধ নেই মালতীর তরে ! ···

১৩৫১
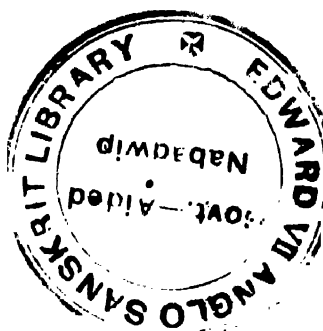
স্বাধীনতা দিবস

নতুন ফসলের দিন। কিন্তু মাঠে একটি জন-প্রাণীকেও দেখা যায় না। সমুদ্র-লেহিত সুদীর্ঘ প্রান্তর ধূ-ধূ ক'রছে দূর থেকে দূরে অনাদিকালের একটা অতিকায় মুমূর্ষু জন্তুর মত। ফাটা মাঠের পাঁজরায় উড়ে এসে বসে ঘুঘু আর পায়রার ঝাঁক—কয়েক মুহূর্তের জন্য, তার পর আবার উড়ে যায় আকাশে—রিক্ত গ্রাম-গ্রামান্তরের আকাশে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন অম্বিকাচরণ বৈঠকখানা থেকে: মাঠের প্রান্ত ঘিরে হাঘ'রেদের মত বাঁধা ছোট ছোট টঙ—কিসান পাড়া, তাঁতী, কুমোর কামারের ঘর। ঝড়ে ভাঙা ঘরের ধসে পড়া দেয়ালের ঢিপির ওপরে বুক ঠুকে যেন প্রাণপণে পড়ে আছে টঙগুলো। নিঃশব্দে তামাক টানতে টানতে দেখেন অম্বিকাচরণ আর তাঁর মনের মধ্যে বিরাট একটা ভূখণ্ড উঁকি মারে—মনোহর দাসের ভাঙা দালান পেরিয়ে, কুমোর পাড়ার এক-শ বিঘের ঘেরটা পেরিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় আফজল শেখের পীরোত্তর পাঁচ কাঠা জমির ওপরে গিয়ে। যেন সেই জমির ওপরেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আনমনে ভাবেন অম্বিকাচরণ। তার পর হঠাৎ চমকে ওঠেন সুমুখে চৌকিদারকে দেখে।

কি ব্যাপার চৌকিদার—এমন সকালে যে?

দারোগা বাবুর ডাক।

দারোগা বাবু! হঠাৎ তিনি যে ···

হঠাৎ যেন বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়েন অম্বিকাচরণ। চাদরটা কাঁধে ফেলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েন চৌকিদারের সঙ্গে।

অম্বিকাচরণকে দেখে দারোগা সহাস্যে ব'লে উঠলো, এই যে আসুন এস-ডি-ও সাহেব।

অম্বিকাচরণের বুকটা শুধু টিপ্ টিপ্ করে। অতি কষ্টে হাসেন অম্বিকাচরণ। বলেন, কি যে বলেন—তার ঠিক নেই।

কেন? ছ-মাস আগে তো তাই ছিলেন মশায়। আমাদের ঘর-দোর আস্তানা সব ভেঙে দিয়েছিলেন তো তাড়িয়ে। ···

বেঁটে-খাটো রিভলভার একটা নিয়ে খেলা করে দারোগা আর হাসে। অম্বিকাচরণ ভাবেন, তার জের আজও কেন টেনে আনতে চায় এ লোকটা হঠাৎ এসে! বহু কাঠ-খড় পুড়িয়ে এড়িয়েছেন তিনি সেবারে—সেই সূত্রে এই লোকটির সঙ্গে হৃদ্যতা তাঁর। কিন্তু হঠাৎ তার আকস্মিক আবির্ভাবে খুশি তিনি হন না এতটুকু—মনটা কাঁপে বাঁশপাতার মত আর টাকা গোণে।

অম্বিকাচরণ বলেন, আপনি হঠাৎ? ···

হঠাৎ কি রকম! সামনে ছাব্বিশে জানুয়ারী—আপনাদের স্বাধীনতা দিবস। দুঃখের বিষয়, দিন পাঁচেক আগে এসে গিইছি। হো হো করে হাসে দারোগা—বলে, মাত্তর গুটিদশেক বন্দুক তো এনেছি, দেখি পাখী শিকার কেমন হয় এবার। ···

বন্দুকের কথাটা বাড়িয়ে বলে দারোগা—জানিয়ে দেয় কথাটা। আর অম্বিকাচরণের বুকের ভেতরে যেন ঢেঁকি পড়ে।

শুষ্ক কণ্ঠে অম্বিকাচরণ বলেন, ও সব কিছু হবে না।

বলেন কি, আপনাদের স্বাধীনতা দিবস!

ওর মধ্যে আর কেন জড়াচ্ছেন আমাকে!

জড়াচ্ছি না। কিন্তু ভেতরের আসল খবর কি বলুন তো ?

দারোগার হাস্যতরল কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন বরফের মত জমে যায়।

কিচ্ছু হবে না। সবাই তো জেলে—যারা আছে তারা চাষাভুষো ··· মরতে বসেছে। ও সব কিচ্ছু হবে না।

আমি তাই চাই। আমি চাইনে কোন কিছু হোক আমার এলাকায়।

এমন জোর দিয়ে বলে কথাটা—যেন এ এলাকা তার উর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের অধিকারে।

তার পর বিদায় নেন অম্বিকাচরণ, বাইরে বেরিয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন যেন।

দারোগা পেছন থেকে বলে, আপনি বলে দেবেন সকলকে।

ভারাক্রান্ত মনে ঘরের দিকে ফেরেন অম্বিকাচরণ। মনের ভেতরে বুকের ভেতরে—যেন কামার শালে হাতুড়ির ঘা মারে নেহাইয়ের ওপরে স্বাধীনতা দিবসের কথাটা। কেমন একটা অজানা ভয় তাঁর সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন ক'রে নামে। ভাবতে ভাবতে চলেন তিনি সারা পথ—গ্রামের সকলকে ডেকে ব'লে দিতে হবে দারোগা আসার হেতুটা—তাঁর বেঁটে-খাট রিভলভারটার কথা, দশ-খানা বন্দুকের কথা।

ঘরের কাছাকাছি এসে দাওয়ায় লোকের ভীড় দেখে মনে পড়ে যায়, আজ তাঁর ধান দেওয়ার কথা আছে।

অম্বিকাচরণ বলেন, এসেছিস সবাই—ভালই হয়েছে। কেউ চলে যাস্ নি যেন —কথা আছে। দারোগা এসেছে।

শুধু এইটুকুমাত্র ব'লে অম্বিকাচরণ ডুবে যান অসংখ্য হিসেবের মাঝখানে। জমির হিসেব করেন নিজে অম্বিকাচরণ আর টাকার অঙ্কে ধানের হিসেব করে তাঁর ছেলে উপেন।

বিশীর্ণমুখ লোকগুলো এগিয়ে আসে একে একে, কাঁদে হাসে, দু-দশ কাঠা যার যা আছে টিপসই ক'রে বেচে দিয়ে যায় অম্বিকাচরণকে। মাঠে ফসল নেই

—একটা মহাক্ষুধা সর্বভূক আগুনের মত দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে যেন অম্বিকাচরণের ধানের গোলা ঘিরে।

হিসেব-পত্রের ঝামেলা চুকিয়ে দারোগার কথা পাড়েন অম্বিকাচরণ। বলেন ছাব্বিশে জানুয়ারীর কথা—স্বাধীনতা দিবসের কথা আর দারোগার দশটা বন্দুকের কথা। দেখেন—বিশীর্ণ কতকগুলো মুখ আতঙ্কে আর উৎকণ্ঠায় বিবর্ণ পাণ্ডুর হ'য়ে যায়।

··· স্বাধীনতা দিবস ··· স্বাধীনতা দিবস ···

অম্বিকাচরণের গম্ভীর কথাগুলো শোনায় যেন তিনি কথা কইছেন বন্দুকের চোঙের মধ্যে দিয়ে। বলেন ঃ

সাবধান—কোন কিছু গোলমাল যেন না হয় এ ক'দিন। কেউ গিয়ে গোলমাল ক'রবিনে রিলিফ অফিসের সুমুখে। তার পাশেই দারোগার তাঁবু।

সকলের দৃষ্টি বিদ্যুতের মত ঝল্‌কে যায় মাঠের পশ্চিমপ্রান্ত দিয়ে ঃ একটা তাঁবু ছিল সেখানে রিলিফ আফিসের—তার পাশে পড়েছে আর একটা তাঁবু।

তাদের ভয়-বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে খুশি হন অম্বিকাচরণ। বলেন, কিছু একটু গোলমাল হলে কারুর নিস্তার নেই কিন্তু আর। দারোগা বলে দিয়েছে আমাকে। পতাকা-টতাকা তুললে এবারে স্রেফ গুলি।

সকলে চেয়ে থাকে তাঁর মুখের দিকে।

অম্বিকাচরণ বলেন, সকলকে তা হলে জানিয়ে দিস এই কথাটা।

উৎকন্ঠিত একটি দল সর্পিল গতিতে মাঠের পথ ধরলো। একটা আসন্ন বিরাট কি যেন বুকে ঘা মারে।

সবাই চলে গেল। শ্রীমন্ত তখনও বসে আছে দাওয়ার এক পাশে। অম্বিকাচরণ যেন তাকে দেখেও দেখেন না।

শ্রীমন্ত তার পর এগিয়ে এল অম্বিকাচরণের সুমুখে। মুখ তুলে তাকালেন অম্বিকাচরণ। হঠাৎ কেমন চমকে যান তিনি—শঙ্কিত হয়ে ওঠেন শ্রীমন্তের

মুখের দিকে তাকিয়ে—চোখের দিকে তাকিয়েঃ সেখানে কেমন একটা অবিশ্বাস আর অনাত্মীয়তা যেন ফেটে বেরুচ্ছে।

অম্বিকাচরণ বলেন, কি ! …

টাকা …

দাঁত খিঁচিয়ে ওঠেন অম্বিকাচরণ, টাকা … টাকা ব'ললেই হ'ল। হোক আগে রেজেষ্ট্রি। ব'লে তো দিয়েছি—রেজেষ্ট্রি হবার পর সকলের বাকি মিটিয়ে দেবো।

ওষুধ-পত্তর কিনতে হবে … তাই, মানে মায়ের অসুখটা বড় বাড়াবাড়ি হয়ে পড়েছে। …

তা হলে আমি কি ক'রবো ! আবার দাঁত খিঁচিয়ে ওঠেন অম্বিকাচরণ, অসুখ বিসুখ নেই কার ! ভারি তো সাত কাঠা জমি … নিয়ে যা তোর টিপ কাগজ—আমার ধান দিয়ে যা। কত নিয়েছিলি—পাঁচমণ না ?

ধান কোথায় পাবে শ্রীমন্ত ? ঝড়ের পর এতদিন পর্যন্ত চলেছে তাই দিয়ে। তীব্র দৃষ্টিতে শুধু সে চেয়ে থাকে অম্বিকাচরণের দিকে। তার পর হাউমাউ ক'রে গিয়ে পড়ে অম্বিকাচরণের পায়ে।

বড় বাবু … আপনি মা-বাপ বড় বাবু … বাঁচান।

আ মলো যা। তবে এক কাজ কর না ! ভিটেটা ত আছে বোধ হয় চার কাঠার মত। দে না সেইটে বেচে। যা—এখুনি দিয়ে যা টিপ সই ক'রে—টাকা দিচ্ছি … ওষুধ-পত্তর যা খুশি কিনিস্ তখন মায়ের জন্যে। শেষের দিকে কোমল হ'য়ে আসে যেন গলাটা অম্বিকাচরণের।

ভিটে … শেষ কালে ভিটেটুকুও নেবেন বড় বাবু … চোখে জল, গলা কাঁপে শ্রীমন্তের। বলে, আমার যে আর কিছুই রইলো না এ গাঁয়ে। তাছাড়া দু-দিন বাদে তাড়িয়ে দিলে, ওই বুড়ীকে নিয়ে দাঁড়াবো কোথায় !…

তাড়িয়ে দিচ্ছে কে তোকে ?

দেবেন বড় বাবু … দেবেন আপনি, আজ না হয় কাল …

বলে কি লোকটা মুখের ওপরে! অবাক হন অম্বিকাচরণ। লোকটা চোখ মোছে গামছায়—আর বলে কাঁপা গলায়। কিন্তু তার মধ্যে কোথায় একটা কঠোর নির্মম চাবুক আছে—যেটা দাগ কাটে অম্বিকাচরণের সর্বাঙ্গে। মুখ ফিরিয়ে ঢোকেন তিনি সোজা ঘরের মধ্যে।

শ্রীমন্ত মাঠের পথ ধরলো। দলটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে মাঠের মধ্যে।

তারা জিজ্ঞেস করে সাগ্রহে, কি শ্রীমন্ত—পেলি টাকা?

নাঃ, বলে ভিটেটুকু ছেড়ে দে।

শালা শকুন। ···

দাঁতে দাঁত চেপে বসে সকলের, চওড়া হ'য়ে ওঠে মুহূর্তের জন্যে সবগুলো চোয়াল। ফুলে ওঠে কপালের একটা শিরা।

প্রচণ্ড অবিশ্বাসের তীব্র দৃষ্টিতে জোড়া জোড়া কোটরপ্রবিষ্ট চোখ তাকায় অম্বিকাচরণের পাকা দালানের দিকে বিদীর্ণ প্রান্তরের ওপর থেকে। অস্ফুট কণ্ঠে বলে সকলে:

আমাদের পাওনা ··· পাওনা দেবে তো?

শ্রীমন্ত বলে, আমার মত হয়তো দেবে।

কূল কিনারা পায় না শ্রীমন্ত—ইচ্ছে করে না আর ঘরে ফিরতে। কোথায় পাবে সে টাকা, কোথায় পাবে সে ওষুধ, পথ্য—এত সব! ··· ভাইটা থাকলে দু-জনের মধ্যে কেউ একজন কোথাও গিয়ে দু-পয়সা রোজগারের চেষ্টা দেখতো। কিন্তু সে মুখ থুবড়ে মরেছে ছ-মাস আগে থানার সুমুখে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকায় চারদিকে শ্রীমন্ত—একটা পাগল যেন মাথা ঝাড়া দিয়ে ওঠে তার বুকের মধ্যে। মৃত্যুর সঙ্গে পাশাপাশি সবাই মিলে একটা যেন গভীর ষড়যন্ত্রে তাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলতে চায়—দম যেন বন্ধ হ'য়ে আসে।

দিনের মধ্যে পাঁচবার ছোটেন অম্বিকাচরণ দারোগার কাছে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তুলে দেখে গ্রামের সকলে: কি একটা মহাসর্বনাশকে যেন ডেকে আনছে

অম্বিকাচরণ দারোগার সঙ্গে যুক্তি ক'রে। আর দিনের পর দিন ধরে যার যা আছে সঁপে দিয়ে আসে অম্বিকাচরণের কাছে।

দাঁতে দাঁত চেপে বলে, দে পতাকা তুলে আর বছরের মত। মরবে অম্বিকাচরণ। আমাদের কি—কি আছে আমাদের!

দারোগা সফর করে গ্রাম-গ্রামান্তরে সশস্ত্র দলবল নিয়ে। এ গ্রামেও এল একদিন—অম্বিকাচরণের বাড়ীতে।

কি খবর?

কোনো খবর নেই। অম্বিকাচরণ বিবর্ণ মুখে হাসি টেনে বলেন, আমি সব ঠিক ক'রে রেখেছি। কোনো ব্যাটার সাধ্যি নেই কিছু করার—ব্যস্ত হবেন না আপনি।

গ্রামের ভেতর দিয়ে দলবল নিয়ে দারোগা চলে গেল কুচকাওয়াজ ক'রে। হঠাৎ যেন গ্রামটাকে জনশূন্য মনে হয় দারোগার। কান খান খাড়া ক'রে শুনতে শুনতে যায়—কোথায় কে যেন কাঁদছে টেনে টেনে অনেক দূরে। ক্রমশ সে কান্না সরে যায় দূরে।

অম্বিকাচরণ তাকিয়ে থাকেন তাদের চলে যাওয়ার দিকে। তার পর হঠাৎ চমকে ওঠেন সুমুখে শ্রীমন্তকে দেখে। তার উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে কেমন ভয় করে তাঁর হঠাৎ—তার পর চেপে বসে দুটো চোয়াল। বলেন:

কি চাস্?

ভিটেটুকু দিতে এলাম। ···

কেমন যেন বেপরোয়া ভাবে বলে শ্রীমন্ত। অম্বিকাচরণের স্তম্ভিত দৃষ্টি ঘোরে তার সর্বাঙ্গে। বলেন, সেই এলি—আগে এলেই ··· তা তোর মায়ের অবস্থা কেমন?

কি জানি, বাঁচবে কি-না। মরুক ভিটে খেয়ে।

মেজাজের ঠিক নেই শ্রীমন্তের যেন। আর কোনো কথা না ব'লে কাগজে টিপ সই ক'রে নেন অম্বিকাচরণ।

তার পর টাকা গুণে নিয়ে চলে যায় শ্রীমন্ত সোজা ডাক্তারখানার দিকে।

ডাক্তার এল, ওষুধ এল—কিন্তু বাঁচলো না শ্রীমন্তের মা।

ডাক্তার ব'ললো, শেষ অবস্থায় আর কি ক'রবো আমি। ওষুধ খাওয়াও।

কারুকে খবর দিল না, কারুকে ডাকলো না শ্রীমন্ত। চাটাই মুড়ে টেনে ফেলে দিয়ে এল খালে সন্ধ্যার নিঃশব্দ অন্ধকারে। তার পর ফিরে এসে চুপ ক'রে বসে রইলো দাওয়ায়। নিঃশব্দে একটা ঝড় যেন বয়ে যায় তার ওপর দিয়ে।

প্রান্তর আর আকাশ ঘিরে গভীর অন্ধকার থম থম ক'রছে। সেই সুগভীর অন্ধকারে দীপ্ত চোখে চেয়ে থাকে শ্রীমন্ত। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়া একটা মূর্তি ভাসে চোখে, আর একটা রোগশীর্ণ মূর্তি ভাসে খালের জলে। তার পর নিঃশব্দে জলের ধারা নামে চোখ দিয়ে।

··· স্বাধীনতা দিবস ···

হঠাৎ যেন বুকটা দুরুদুরু ক'রে ওঠে—আর একটা ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়তে চায় শ্রীমন্ত। সুমুখের তিমিরাবৃত পৃথিবীটাকে ছিঁড়ে ছত্রখান ক'রে দিতে ইচ্ছে করে তার। মরুক অম্বিকাচরণ—একটা তিনরঙা পতাকাকে ভয় করে সে। একটা পতাকা যদি পেত শ্রীমন্ত! ···

শেষরাত্রির দিকে ঘা পড়ে রাখালের দরজায়।

রাখাল! ···

কে! ···

আমি শ্রীমন্ত।

ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল রাখাল।

এত রাতে যে! তোর মা কেমন?

সে নেই, ফেলে দিয়ে এসেছি খালের জলে। আমি চলে যাচ্ছি রাখাল। ···

ভিটেটুকুও শেষ পর্যন্ত গিয়েছে শ্রীমন্তের—জানে সবাই। রাখাল কিছু বলে না, দাঁড়িয়ে থাকে চুপ ক'রে।

শ্রীমন্ত বলে একটু হেসে, তা হ'লে যাই। কি যেন ব'লবার জন্য তার পর উসখুস করে শ্রীমন্ত। একটু হেসে বলে, কেউ জিজ্ঞেস ক'রলে বলিস, আমি চ'লে গিয়েছি। মালতীকে বলিস্। ...

কোথায় যাবি ?

কোথায় আর ... দেখি। ...

শ্রীমন্তকে দেখা যায়-না অন্ধকারে। রাখাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মাঠের ওপারে একটা ঘরের দিকে আর তারও বুকে একটা ক্রুদ্ধ আক্রোশ মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে। তাকেও হয়তো চলে যেতে হবে এ-গ্রাম ছেড়ে।

সে রাত্রি ভোর হ'লো।

স্তম্ভিত হ'য়ে দেখেন অম্বিকাচরণ, অধরের ভিটেতে খবরকাগজের ওপুরে রং করা একটা জাতীয় পতাকা উড়ছে বাঁশের আগায়। মাঠের ওপার থেকে কুচকাওয়াজ ক'রে আসছে দারোগা তার দলবল নিয়ে আর কিসান পাড়া, কুমোর পাড়ার গা ঘেঁষে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে বিশীর্ণ কালো কালো মূর্তিগুলি। ছাব্বিশে জানুয়ারী—ছাব্বিশে জানুয়ারী কবে ? হিসেব করেন অম্বিকাচরণ, আজই তো ! পতাকাটার দিকে সভয়ে চেয়ে থাকেন তিনি।

১৩৫১

সালতামামি

লক্ গেটের বাইরে—ক্যানেলের মুখে বিদেশী মহাজনি নৌকো দুটো নোঙর ক'রেছে এসে।

খবর নিয়ে এলো রাখাল দাস।

সাত আটশ' ক'রে মাল পড়বে এক-একটায়।

আমাদের এদিকেই আসবে তো?

কিচ্ছু ভাবতে হবে না বড়বাবু, ইদিকেই আসতে হবে। উদিকে আর আছে কি! শ্মশানের মতো তো নোনা ধরে খাঁ খাঁ ক'রছে সব। আমাদের এই ভেতরের দিকে আসতে হবেই।

ডেকে দে দেখি একবার নায়েবকে।

তার পর নায়েব এল হন্তদন্ত হ'য়ে :

আমাকে ডাকছিলেন বড়বাবু?

রাখাল নাকি দেখে এল—দুটো মহাজনি নৌকো ঢুকছে ক্যানেলে। এই মওকায় ধান না ছাড়তে পারলে দাম পাবে না। সরকারী হাঙ্গাম শুরু হবে সব। কিন্তু এদিকে ধান কাটতে তো কেউ হাতই দিল না। ...

হবে—ঠিক হ'য়ে যাবে সব পনেরো দিনের মধ্যে। দেরি হ'য়ে গেল এবার একটু। চাষীরা মরে গেল কতক—কতক পালালো, বাকী কটা তো ধুঁকছে ম্যালেরিয়ায়। তা হ'য়ে যাবে সব।

কিন্তু পনেরো দিন যে অনেক দেরী হ'য়ে যাবে! বাইরে থেকে লোক এনে লাগাও না হয়। যা ছাড়বে—এই বেলা। বুঝলে—

বুঝেছে নায়েব—ভালো ক'রেই সে বুঝেছে। হুকুম দিল গোমস্তাদের—হাত নাগাদ সব হিসেব-পত্র পরিষ্কার ক'রে ফেলতে। কার কাছে কত পাওনা দেনা আছে—তার সুদ শুদ্ধ হিসেব। ধান ভাল হ'য়েছে এবার। অভাব অনটন অনেক গিয়েছে যথারীতিতে, তার পর প্লাবন গিয়েছে, দুর্ভিক্ষ গিয়েছে—পাওনার অঙ্ক মোটা হ'য়ে বসেছে চাষীদের নামের পাশে পাশে। গোমস্তারা হিসেব করে খাতায়ঃ

মহেন্দ্র দাস।

ফৌত। পঞ্চাশ মণ তিন কাঠা।

ব্রজেন দাস।

ফৌত। সাতচল্লিশ ···

ব্রজেন দাস ফৌত মানে?' তার বৌটা গে

কি জানি। লেখ না বাবা। জৈগুন বিবি ষাট মণ।

ফৌত?

ফৌত—সব ফৌত? যা বলি লেখ। জৈগুন বিবির টিক্‌টিকির মতো দুটো ছেলে আছে না?

ওরা হিসেব করে বছরের। মাঠের ধান পেকে উঠেছে শেষ কালে—অনেক দিন পরে—অনেক দিন ধরে। বড্ড যেন দেরি হয়ে যায়। মোবারক চেয়ে চেয়ে দেখে।

ক্ষীণকণ্ঠে ডাকলো মোবারক, বাপজান। ···

বুড়ো ইসমাইল মোবারকের বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো।

ভাগাড়ের কাছে জমিটায় কত ধান হবে?

তা হবে—মণ বারো হবে।

হাড়ের সার পাওয়া জমি—হবেই তো। হাসলো মোবারক—ব'ললো, আগের বছর দেখবি—সব জমিতে সকলের জমিতে ভালো ধান হবে। এ-বছর কম হাড় ছড়ালো চার দিকে! সব জমিতে সার পাবে—এ একেবারে মানুষের হাড়ের সার। কতখানি ধান কাটা হ'য়েছে আমাদের?

বিঘে দেড়েক হবে।

মোটে! বিষণ্ণতায় মোবারকের কণ্ঠ ভরে উঠলো, আমি আর ধান কাটতে পারলুম না। মাঠের আর সকলের ধান কাটা হ'য়ে গিয়েছে বাপজান?

না, এই তো সব নামলো মাঠে জ্বর গায়ে। ইদিকে নায়েবের হুকুম হ'য়েছে—সাতদিনের মধ্যে কেটে তুলে মাড়িয়ে সব শেষ ক'রতে হবে।...

তাই তো!... আমি আর ধান কাটায় লাগতে পারলুম না। এ যেন মস্ত একটা ক্ষোভ মোবারকের। একটু হেসে বলে, বর্ষার সময় তোকে ছুটি দিয়েছিলাম—এখন কাট বাপ্‌জান। অতো দুঃখের দুটি ধানের চাল শেষ পর্যন্ত পেটে পড়বে কি-না কে জানে!...

বাজে বকিস্ নি তো।...

হাসলো মোবারক। ব'ললো, আমাকে বাইরে একটু নিয়ে চল্ না বাপ্‌জান।...

ডাক্তার যে বারণ ক'রেছে ঠাণ্ডা লাগাতে!

করুক বারণ। মাঠের দিকে কত দিন যে দেখি নি চোখ তুলে ... নিয়ে চল্ একটু বাইরে।

বাইরের দাওয়ায় একটা চাটাই পেতে ইসমাইল মোবারককে এনে শুইয়ে দিল।

ম্লান আর বিষণ্ণ হ'য়ে এসেছে শীতের গোধূলি। দূরন্ত মাঠের দিকে মোবারক চেয়ে রইলো। সারা বর্ষাটা সে খেটে এসেছে ওই মাঠে আধপেটা খেয়ে।

চাষের কাজ কোন রকমে সেরে তারপর বিছানা নিয়েছে সে। মাসের পর মাস কেটে গিয়েছে ওই মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে। কচি ধানগাছগুলি বড় হ'য়ে উঠেছে—উছলে পড়েছে উচ্ছ্বসিত গভীর সবুজের বন্যায়। তার পর এসেছে কেশর। আর মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে রোগে জীর্ণ হ'য়েছে মোবারক। স্ত্রী মারা গিয়েছে তার চিকিৎসার অভাবে, একে একে শোথে ফুলে মরেছে ছেলে দুটো। তবু পাকে নি মাঠের ধান। বড্ড দেরি ক'রে এলো ধান কাটার দিন। শয্যাশায়ী মোবারক—শেষ কালে শীতের মাঝামাঝি ধরলো তাকে নিমুনিয়ায়।

শীতের সন্ধ্যা ঘন হয়ে এল—সমস্ত কিছু দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে এল ধোঁয়াটে কুয়াশায়। তবু যেন স্পষ্ট দেখতে পায় মোবারক পাকা ফসলভরা দূরন্ত মাঠের মাঝখানে তার জমির টুকরোগুলো। ওই ধান ঘরে উঠবে তার শেষ পর্যন্ত! ···

ইসমাইল ব'ললো, চল এবার ঘরে।

বাইরে বেশ লাগছে বাপজান্। ···

বেশ লাগছে! এদিকে ভালো মানুষ আমরা, শীতে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু ভয়ানক ভালো লাগছে মোবারকের। অন্ধকারাচ্ছন্ন পাকা ফসলের ক্ষেতের দিকে চেয়ে মন ভ'রে ওঠে তার। মনে হয় তার, এতদিনে সব কাজ যেন তার শেষ হয়েছে। অন্ধকার আকাশে তারাগুলি একটি একটি ক'রে ফুটে ওঠে। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে আমিনার কথা মনে পড়ে তার। গোর দেওয়া হয় নি তাকে—ভাসিয়ে দিয়েছিল খালের জলে। সেখান থেকে ভেসে ভেসে কোথায় গিয়ে পড়েছে সে—সে কি অনেক দূরে! ··· সে নিজেও হয়তো বাঁচবে না। মরে যাবে হয়তো মোবারক। ঐ ক্ষেতের দিকে চেয়ে চেয়ে মরে যাবে—তারা যেমন ক'রে মরে গিয়েছে একে একে।

ইসমাইল আত্মগত হ'য়ে ব'ললো, কেমন ক'রে যে সব শেষ হবে সাত দিনের মধ্যে! ···

কেন, মালিকের অতো তাড়া কিসের!

রাখাল দাস নাকি দেখে এসেছে, মহাজনি নৌকো আসছে দুটো। ধান বেচবে—তাই অতো তাড়া হুড়ো। ···

এই ধান বেচে দেবে,—আমাদের এত দুঃখের ধান!

ধানের দাম আছে—ছেড়ে দেবে এই সময়ে। তা কম ধানও তো পাবে না এবারে! আধাআধি ভাগ, তার পর তিন বছরের ঋণ, তার পর তার সুদ।

চাষীর ঘরে সেই নেই নেই। বেচে দেবে সব ধান! ··· মনে মনে বলে মোবারক।

আমাদেরও তো দু-এক মণ ছাড়তে হবে। ···

ধান বেচবি!—কেন? ···

কাপড় চোপড় আছে, ঘর সংসারের জিনিস-পত্র কেনাকাটা আছে।

আমিনা মরে গেছে, তার ছেলে দুটো মরে গেছে—তাদের ধানটা বেড়ে যাবে, না? হেসে শুধালো মোবারক।

বুড়ো ইসমাইল চটে উঠলো, না বেচলে টাকা পাবো কোথায়। তোর চিকিচ্ছে আছে—ডাক্তার এমনি আসতে চায় না। দুটি ক'রে টাকা নেয়—তবে আসে। নামে সরকারী রিলিফের ডাক্তার—কিন্তু টাকা ছাড়া আসতে চায় না। দেখলিতো আমিনার কলেরার সময়। তার পর তোর ওষুধের দাম।

এক কাজ কর বাপজান্। ওষুধ আর ডাক্তারের দরকার কি! আমিনা গেছে, ছেলে দুটোও গেছে। তার পর আমি মরে গেলে—যে ধানটা বেড়ে যাবে তোর হিসেবে—দিল্ ভরে বেচিস্ তখন। ···

তার পর চুপ ক'রে যায় দু-জনে।

মোবারকের মনের সমস্ত প্রশান্তি যেন ভেঙে চুরমা[illegible]।

ইসমাইল মুখ ভার ক'রে নিঃশব্দে উঠে গেল মোবারকের কাছ থেকে।

ওদের মধ্যে অত্যন্ত কুৎসিত একটা কলহ হ'য়ে গিয়েছে যেন—এমনি ভাবে মোবারক আর ইসমাইল মুখ ভার ক'রে থাকে। রাত্রিতে শুতে যাওয়ার আগে

পর্যন্ত কেউ কারুর সঙ্গে আর কথা বলে না। বুড়ো ইস্‌মাইল মুখ ভার ক'রে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো একপাশে।

গা হাত পা কেমন যেন ব্যথা ইস্‌মাইলের। ঝুঁকে ঝুঁকে ধান কাটা সারা দিন। বিছানায় শুয়েও পেশীগুলো শরীরের যেন খিঁচে থাকে। তবু শেষ করতে হবে তাকে—সাত দিনের মধ্যে, মালিকের হুকুম। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে ইসমাইলের—একটা অস্ফুট আর্তনাদ ঃ

আল্লা। ···

মোবারক অন্ধকারে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

গভীর রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় মোবারকের। বাঁশের কবাটটা খুলে কে যেন বেরিয়ে গেল বাইরে। ভাঙা ফুটো খড়ের চালা দিয়ে অনন্ত আকাশের জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরের ভেতরে। তরল অন্ধকারে চেয়ে দেখলো মোবারক, ইসমাইল বিছানায় নেই। কোথায় গেল এত রাতে সে! মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে গেল। অনেক্ষণ জেগে রইলো মোবারক। ক্লান্তিতে এক সময়ে তার তন্দ্রা এল।

তার পর খস্ খস্ শব্দে তন্দ্রা ভেঙে গেল তার। ইসমাইল নিঃশব্দে একটা থলের ওপরে অক্লান্ত ভাবে পা ঘষে চলেছে—আর খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে একটা। যেন খড়ের মস্ মস্ শব্দ হয় আর পরিপূর্ণ নিটোল ধানগুলির পরিচিত মিঠে শব্দ একটা লাগে এসে কানে। অন্ধকারে কি ক'রছে ইসমাইল কি জানি! ···

মোরগ ডাকে শেরআলি খাঁর। এ পাড়ায় শুধু তারই একার মুরগী আছে। আর সকলের গরু-ছাগল-মুরগী একটিও নেই। শেরআলির মুরগী চিৎকার করে থেকে থেকে।

হয়তো ভোর হয়ে এলো।

ইসমাইল তখনও থলেতে পা ঘষে চলেছে।

তার পর এক সময়ে ইসমাইল নিশঃব্দে এসে শুয়ে পড়লো।

শেষ রাত্রির অন্ধকার নিঃশেষ না হ'তে হ'তেই উঠে পড়লো বিছানা ছেড়ে ইসমাইল আবার। হাতে কাস্তে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

মোবারক দেখে নিঃশব্দে। তার পর উৎকর্ণ হয়ে শোনে—বাইরে কার সঙ্গে যেন কথা কাটা-কাটি হ'চ্ছে ইসমাইলের।

এই রকম চুরি কবে থেকে শুরু ক'রেছ মিঞা?—এ্যাঁ, তুমি তো কই এ-রকম ছিলে না।

চুরি মানে!

চুরি মানে? বলি এই যে এক্ষুনিকার কাটা খড়গুলো ঢাকবে কোথায়? আমার এক কাঠা জমি একেবারে সাবড়ে দিয়েছ! ...

অমনি মুখে ব'ললেই হ'লো!

কেন, তোমার জাতভাই শেরআলি দেখেছে তো। কেন, তোমার নিজের ধান হয় নি? না সেটা বেচবে আর পরের ওপর দিয়ে যতোটা পারো—উসুল ক'রছো। আচ্ছা, নায়েবকে ব'লছি গিয়ে সব আমি। ...

বুড়ো ইসমাইলও চিৎকার করে। কোনো নিদর্শন নেই তার চুরির। এক কাঠা জমির ধান কেটে উঠিয়ে নিয়ে এল—আর রাতারাতি মাড়িয়ে লুকিয়ে ফেললো সে! কই, একটা ধানের কণা বাইরে পড়ে থাকতে দেখাক কৈলাস। সদ্য কাটা খড় কি তার নিজের জমির হ'তে পারে না! ...

কৈলাস ব'ললো, কতদিন ধরে তোমার এই কাম হ'চ্ছে—কে জানে। আজই তো পড়লো চোখে। যাক, চললাম আমি নায়েবের কাছে।

কৈলাস অল্প কথায় আসন্ন বিপদের আভাস দিয়ে চলে গেল। ইসমাইল দাঁড়িয়ে রইলো ঠায়।

মোবারকের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো ইসমাইল। মবারক ডাকছে তাকে। যেতে ইচ্ছা করে না ইসমাইলের—কেমন যেন হঠাৎ ভয় করে তার। তবু যেতে হয়।

মোবারক ক্লান্ত কণ্ঠে ব'ললো, কি বলে কৈলাস?

ও কিছু না।

কিন্তু মোবারকের কাছে বিষয়ের গুরুত্বটা স্পষ্ট হ'য়ে গিয়েছে এতক্ষণে। থলের মধ্যে ধানের শীষ শুদ্ধ খড় ভরে পা দিয়ে মাড়িয়েছে ইসমাইল—শুধু আজ নয়, একদিন-দু-দিন—তিনদিন। কয়েকদিন ধরে রাত্রিতে উঠে এই ক'রছে ইসমাইল। দেখেছে মোবারক—বুঝতে পারে নি কিছু অন্ধকারে। আজ সবটা তার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে গিয়েছে।

যে ধানের জন্যে এত কাণ্ড, তাকেই তুই আবার বেচতে চাস বাপজান্! …

বুড়ো ইসমাইল হঠাৎ হাউ মাউ ক'রে কেঁদে উঠলো, সে আল্লা জানে—কেন চুরি করি। কেন বেচতে চাই। একে একে সব গেছে—তুই গেলে আর আমার থাকবে কে! … আমার তো মরণ নাই। …

ইসমাইল দাঁড়ায় না আর। চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে যায় কাস্তে নিয়ে।

মনটা ভারি হ'য়ে যায় মোবারকের।

তার পর সে একটা সন্ধির সূত্র খোঁজে।

মধ্যাহ্নে মাঠ থেকে ফিরে এল ইসমাইল। ফিরে এসে রান্নার জোগাড় ক'রতে লাগলো।

মোবারক ব'লে উঠলো, বাপজান্—আমি আজ ভাত খাবো দুটি। …

ভাত! মোবারকের কথায় হঠাৎ প্রাণমন যেন হেসে উঠলো ইসমাইলের —কেটে গেল একটা দুঃসহ গুমোট মন কষা-কষির। হেসে উঠলো ইসমাইল। ব'ললো, ভাত খাবি—কিন্তু ডাক্তার যে …

মরুক তোর ডাক্তার। নতুন চাল পেটে পড়ুক দুটি—দেখবি, সব অসুখ আমার সেরে যাবে। আমি ভাত খাবো বাপজান্।

খা তবে।

শুধু ভাত আর নুন। মাটির সানকিতে ক'রে খাওয়া। পেতল-কাঁসার বাসন-কোসন নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছে বহুদিন। মনের আনন্দে পাশাপাশি খেতে ব'সলো ওরা।

খাওয়া-দাওয়ার শেষে মাঠের কাজে বেরুচ্ছিল ইসমাইল। মোবারক ব'লে উঠলো, আমাকে বাইরে শুইয়ে দিয়ে যা বাপজান্।

ইসমাইল বাইরে বিছানা পেতে মোবারককে শুইয়ে দিয়ে মাঠে চলে গেল।

ভাত খেয়েছে মোবারক, ভালো হ'য়ে উঠবে মোবারক। ইসমাইলের স্থবির পদক্ষেপে হঠাৎ যেন দ্রুততা আসে। আমিনা মরে গেছে—যাক। আর একটি কচি মেয়ের মুখ ভাসে বুড়োর মনে। অনেকগুলি মৃত মুখের মাঝখানে একটি জীবন্ত কচি সুন্দর মুখ।

মোবারক শুয়ে শুয়ে চেয়ে থাকে মাঠের দিকে। বহুদূরে অস্পষ্ট কালো মূর্তি-গুলি ঝুঁকে ঝুঁকে ধান কাটছে। অনেক দিন পরে ধান কাটছে। গোরস্তানের কিছুটা দেখা যায় এখান থেকে। মাঠ থেকে চোখ ফিরিয়ে কখন চেয়ে থাকে সেই দিকে মোবারক। নিঃশব্দ নির্জন ছায়াভূমি। আমিনার কথা এসে পড়ে, ছোট দুটো ছেলের কথা এসে পড়ে। সে অনেক দিনের অনেক সুখ দুঃখের কথায় হৃদয়মন ভরে ওঠে মোবারকের। তার পর এক সময়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ ফিরিয়ে নেয় মাঠের দিকে।

সমস্ত দুপুরটা কেটে গেল এমনি ভাবে।

শীতের বিষণ্ণ সূর্য অস্তে নামলো।

ইসমাইল মাঠ থেকে ফিরলো যখন, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে মোবারকের।

ভাত দেওয়ার পর ভয় ভয় ক'রছিল ইসমাইলের। মোবারকের গায়ে হাত দিয়ে মুখ শুকিয়ে গেল তার।

মোবারক তবু হাসলো।

সন্ধ্যা উৎরে রাত হ'লো গভীর। ক্রমশ আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়লো মোবারক।

ভোরে উঠে দেখলো ইসমাইল, মোবারক নিঃশ্বাস নিচ্ছে হাঁ ক'রে।

তখুনি ছুটে যেতে ইচ্ছে করে ইসমাইলের—কিন্তু টাকা, টাকা কোথায় পাবে সে! মাত্র দুটো টাকা। বার্ধক্যজীর্ণ শরীরে যেন ওর শেষবারের মতো সমস্ত শক্তি ফিরে আসে। কেউ যদি মজুর খাটাতো তাকে, আর দিত দুটো টাকা—

ডাক্তারের ফি। কিন্তু এ গ্রামের চাষীরা তাকে ধান কাটায় মজুর হয় তো নেবে এখুনি, টাকা দেবে না—বদ্‌লি দেবে। গ্রামে টাকা নেই।

তবু উদ্‌ভ্রান্তের মতো দাঁড়ালো গিয়ে সে ডাক্তারখানার সুমুখে। ভয়সন্ত্রস্ত কণ্ঠে ব'ললো, ডাক্তারবাবু—যেতে হবে একবার।···

যাবো। ডাক্তার নির্লিপ্তকণ্ঠে কম্‌পাউণ্ডারকে দেখিয়ে ব'ললো, বলো ওকে।

অর্থাৎ কম্‌পাউণ্ডার এইখানকার স্থানীয় লোক, বিদেশাগত ডাক্তারের আর্থিক সুবিধে ক'রে দেয় এই লোকটা।

কম্‌পাউণ্ডার ব'ললো, কি-হয়েছে! ···

সেই যে নিমুনিয়া হ'য়েছিল মোবারকের! ···

ও। টাকা দে। ···

টাকা এখন নেই ডাক্তারবাবু। ধান বেচ্‌লে দেবো। নৌকো আসছে।

যা ভাগ্‌ ···

কম্‌পাউণ্ডার অন্য রোগী নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। কোন কথার উত্তর দেওয়ার মতো সময় হয় না আর তার।

হঠাৎ চোখ ছল্‌ ছল্‌ করে ইসমাইলের। শুধু একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে ঃ

আল্লা! ···

তার পর আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে সে ডাক্তারখানার ভিড়ের ভেতর থেকে। নত মুখে স্থবির পদক্ষেপে এগিয়ে চললো বাড়ীর দিকে।

মোবারক মরে গেল—যেমন ক'রে তার স্ত্রী মরেছে; যেমন করে তার কচি দুটো ছেলে মরে গিয়েছে। চাটাই মুড়ে খালের জলে ভাসিয়ে দিল তাকে ইসমাইল। কবর খোঁড়ার লোক নেই—জোর নেই এ পাড়ার মুসলমানদের হাতে, জোর নেই আর স্থবির ইসমাইলের হাতে।

ভাটায় ভেসে গেল মোবারক। আর বুড়ো ইসমাইল ধান কাটে ঝুঁকে ঝুঁকে।

ছ-দিন—সাত দিন—আট দিন কেটে গেল, এখনও হ'লো না তার শেষ।

'ধান কাটতে কাটতে কখনো কখনো অন্য মনে চেয়ে থাকে সে খালের দিকে—যেখানে ভাসিয়ে দিয়েছিল মোবারককে। কাজে যেন মন বসে না। মাঠের সকলে কাজ শেষ ক'রে ঘরের দিকে ফিরে যায় মাথা নীচু ক'রে। ইসমাইল ফেরে একা—খালের দিকে চেয়ে চেয়ে।

হঠাৎ একদিন সে চমকে উঠলো দূরে একটা মহাজনি নৌকো দেখে। তাই তো! তার কাজ শেষ হয় নি এখনও।

নৌকোর কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালো সে। কতকগুলো লোক, বিভিন্ন বয়সের—বস্তা বস্তা হাড় এনে ফেলছে নৌকোতে। মাঝি মাল্লারা পশ্চিমা মুসলমান।

একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রলে ইসমাইল, ধানের নৌকো দুটো কত দূরে?

জানি না তো। আমাদের দু-খানা নৌকাইতো ঢুকেছে শুধু ক্যানেলে।

পাচখালিতে ছিলে তোমরা?

হুঁ, সেখান থেকে একখানা নৌকো পশ্চিম দিকে চলে গেল—আমরা এইদিকে আসছি।

আর কোন নৌকো নাই?

নাঃ। আট দশ দিনের এদিকে কোনো নৌকো দেখি নি।

তবে এরাই!… মনে মনে বলে ইসমাইল। হঠাৎ হাসি পায় তার। ক্যানেল পাড় থেকে নেমে মাঠের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে থাকে সে—আর হাসে।

হাস কেন মিঞা?

মাঠের চাষীরা মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে।

হাড়—হাড়ের নৌকো নিয়ে এসেছে পশ্চিমা মুসলমানরা। ধানের নৌকো নয়।

মানে!

দেখা হয়েছিল, জিজ্ঞেস ক'রে এই তো জেনে আসছি।

হাড়!

পাকা ফসলের সারা মাঠ ভরে' মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে একটি কথা। চাষীরা সোজা হয়ে কাস্তে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। যেন বুঝতে পারছে না কথাটা কেউ।

ইসমাইল হাসতে হাসতে এগিয়ে চললো মাঠ ভেঙে জমিদার বাড়ীর দিকে।

কর্মচঞ্চল বৈঠক সেখানে। গোমস্তারা বছরের হিসেব ক'রে চলেছে।

গোফুর খাঁ।

ফৌত। পঁচিশ মণ।

সেক্ রমজান।

ফৌত। চল্লিশ মণ।

সেক্ মোবারক।

চল্লিশ মণ।

ফৌত। ইসমাইল ব'লে উঠলো দরজার পাশ থেকে।

মানে?

বুড়ো হরিশ গোমস্তা খেঁকরে উঠলো ভবানীর উপরে।

ভবানী ব'ললো, আজ্ঞে আমি বলি নি—ওই ব'লেছে।

সকলে হিসেব থেকে মুখ তুলে দেখলো ইসমাইলকে।

ইসমাইল ব'ললো, কাল মরে গিয়েছে মোবারক।

হুঁ। হরিশ ব'ললো, লেখ তা হ'লে—ফৌত নয়, ইসমাইলের নাম।

ইসমাইল বেঁচে আছে এখনও একা—বুড়ো ইসমাইল।

ইসমাইল ব'ললো, নৌকো এসেছে—ক্যানেলে দেখে এলাম।

একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল সারা বৈঠকখানা ভরে।

দেখলি—ধানটান পড়েছে কিছু এঁ্যা?

আজ্ঞে না, হাড় পড়েছে। হাড়ের নৌকো।

সমস্তটা শুনে গোমস্তারা লম্বা হিসেবের খাতা সুমুখে মেলে রেখে হাত গুটিয়ে বসলো।

ইসমাইল তার পর বেরিয়ে এলো পথে। খালের ধারে ধারে এবার চললো সে ঘরের দিকে এগিয়ে।।

সুমুখে চোখ পড়ে তার। দুটো লোক—অপরিচিত মুখ—আসছে তার দিকে এগিয়ে।

সুমুখে এসে শুধালো, ভাগাড় কোন দিকে মিঞা—ব'লতে পারো?

হাড়?

হুঁ।

গোরুর হাড়—মানুষের হাড় বাছবে কি ক'রে? হাসে ইসমাইল।

ওরা হাসলো—ব'ললো, সব—সব। …

তবে এগিয়ে যাও এই খাল ধারে ধারে।

এই খাল গিয়েছে ইসমাইলের ঘরের পাশ দিয়ে। অনেক চাষী, জেলে, তাঁতী কুমোরের ঘরের পাশ দিয়ে—অনেক গ্রামের মাঝখান দিয়ে। এই খালে আমিনা গিয়েছে, তার ছেলে দুটো গিয়েছে, মোবারক গিয়েছে, মোবারক! … মোবারক হ'য়তো গিয়ে ঠেকেছে কোথাও—ছিঁড়ে খেয়েছে কুকুর-শকুন-শেয়ালে। হাড় পাবে—অনেক হাড় খালের দু-ধারে—ইসমাইলের রাঙী গাইয়ের হাড়, শিং ভাঙা বলদটার হাড়—অনেক হাড়।

এগিয়ে যাও … এগিয়ে যাও ওই খাল ধরে' পশ্চিম দিকে। …

১৩৫১